ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুশীলন সমিতির ভূমিকা

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে

অনুশীলন সমিতির ভূমিকা

জীবনতারা হালদার



প্রকাশক □ ৮২/১ মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা ৯

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুশীলন সমিতির ভূমিকা : জীবনতারা হালদার। প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ ১৩৯৬। ইং ১৪ই এপ্রিল ১৯৮৯। ৮২/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৯ থেকে প্রকাশক প্রকাশনা সংস্থার পক্ষে শিশির ভট্টাচার্য প্রকাশ করেছেন এবং দি সারদা প্রিন্টার্স, ১৫ কানাই ধর লেন, কলিকাতা ১২ থেকে সনাতন সাঁতরা ছেপেছেন। প্রচ্ছদ শিল্পী : ভূপেন সেন।

বিপ্লবী-বাংলার চিরন্তন প্রাণসত্তা-কে

ভূমিকা

অনুশীলন সমিতির ইতিহাস নামে আমার বইখানা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫১ সালে। কয়েকটি সংস্করণও পরে ছাপা হয় পাঠকদিগের আগ্রহে। প্রথম প্রকাশের পর ৩৭।৩৮ বৎসর পার হয়ে গেছে। সেদিনের পরিপ্রেক্ষিত আজ আর নেই। অনেককথা ও ঘটনা সেদিন যেমনভাবে দেখেছি ও ভেবেছি আজ তার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। মনে হচ্ছে সেদিনের অনেক ঘটনার মূল্যায়ন আবার নতুন করে করা প্রয়োজন। প্রাক স্বাধীনতা যুগে যাঁরা মরণ পণ ও সর্বস্ব ত্যাগ করে দেশের মুক্তির কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তাঁদের প্রায় পনের আনা মানুষই আজ অনাদর ও বিস্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে গেছেন। মাঝখান থেকে একদল মধ্যস্বত্ব ভোগী দেশের তাবৎ মানুষজনকে "আরাম হারাম হ্যায়" জাতীয় বাণীর উপদেশ বিতবণ করে নিজেরা সর্বপ্রকার ভোগ, আরাম ও বিলাসের মহোৎসবে মেতেছে। অথচ দেশ ও দেশের মানুষের জন্যে তাদের ত্যাগের দাম কানাকড়িও নয়।

মনে হচ্ছে আজ এসব কথার পুনরালোচনার বিশেষ প্রয়োজন। অথচ আমার বর্তমান বয়স ও স্বাস্থ্য কোনটাই বিস্তারিত কিছু সৃষ্টি করবার পক্ষে অনুকূল নয়। আমার বর্তমান বয়স ছিয়ানব্বই পেরিয়েছে (আমার জন্ম ১৮৯৩ সালের আগষ্ট মাসে)। এ ছাড়াও উক্ত বইখানিতে কিছু কিছু মহৎ মানুষ যাঁরা সমিতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন তাঁদের নাম যথাযোগ্য স্থানে উল্লিখিত হয় নি যদিও সেই অল্প পরিসরের মধ্যে সকলেরই নাম ও পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর ছিল না। তাই সে ত্রুটি কিছুটা পূরণ করে সমগ্র বইটি নূতন করে সাজিয়ে কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে প্রকাশ করার ইচ্ছা বেশ কিছুদিন ধরেই অনুভব করছিলাম। তারই ফলশ্রুতি বইটির বর্তমান আকার। সঙ্গত কারণেই নামকরণেরও কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করা হল। এদিক দিয়ে বর্তমান পুস্তকটিকে একটি সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টিই প্রায় বলা যায়।

এখানে আমি কয়েকটি নূতন তথ্য লিপিবদ্ধ করেছি যেগুলির সংগ্রহের জন্য আমার সূত্র ছিলেন তদানীন্তন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত ফনিভূষণ চক্রবর্তী মহাশয়। তিনি কিছুদিনের জন্যে অস্থায়ী রাজ্যপালের পদে কাজ করেছিলেন। সেই সময়ে তদানীন্তন বৃটিশ প্রধান

মন্ত্রী অ্যাটলি সাহেব কলকাতা হয়ে সিঙ্গাপুরে যাবার পথে এক রাত্রির জন্যে রাজভবনের অতিথি হয়েছিলেন। ঘটনাকাল সিঙ্গাপুরে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের ক্ষমতা হস্তান্তরের অব্যবহিত পূর্বকালের। শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী আমাকে সেদিন অনেক বিস্ময়কর তথ্যই শুনিয়েছিলেন ; যার সবটুকু প্রকাশ করা সম্ভবপর নয় মাত্র সৌজন্যের কারণেই।

বর্তমান লেখার সমস্তটুকু আমার নিজহাতে লিখে ওঠা সম্ভবপর হয় নি। তাই আমি মুখে মুখে বলে গেছি ও শ্রীমান শিশির ভট্টাচার্য সেগুলি ক্রমান্বয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন বেশ কিছু দিন ধরে। বইটি নূতন আকারে প্রকাশের দায়িত্বও তিনিই নিয়ে আমার অশেষ ধন্যবাদ ভাজন হয়েছেন। মুদ্রিত হবার পর বইটি আমি দেখে যেতে পারব কিনা আমার বিশেষ সন্দেহ। তবু বর্তমান প্রকাশকগণকে আমি যথাযোগ্য অগ্রিম আশীর্বাদ জানিয়ে রাখছি। ওঁ তৎসৎ।

কলকাতা, ১৭ই জানুয়ারী ১৯৮৯



জীবনতারা হালদার

গোড়ার কথা

১৯৪৭ সালে পনেরই আগষ্ট ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর অনুশীলন সমিতির অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত সত্যবিনয় মল্লিক মহাশয়ের বাড়ীতে পূর্বতন সভ্য ও প্রধান কর্মীদের অনেকের উপস্থিতিতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত নবলব্ধ স্বাধীনতার জন্যে আনন্দোৎসবে মিলিত হওয়া। এই সভাতে স্থির করা হয় যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিবর্তনের ধারার একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার আশু প্রয়োজন। আর তার জন্যে উপযুক্ত সময় ঠিক এখনই হওয়া উচিত। প্রকৃতপক্ষে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের গোড়াপত্তনই হয়েছিল বাংলাদেশের মাটিতে। সুতরাং এই সংগ্রামের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে গেলে মূলতঃ অগ্নিযুগের ইতিহাস ও অনুশীলন সমিতির গৌরবময় অধ্যায়ই প্রধান ভূমিকায় উজ্জ্বল দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে দেখা দেয়।

আমার পরম সৌভাগ্য সেদিন এই কঠিন কাজের ভার আমার উপরই ন্যস্ত করা হয়। এই উদ্দেশ্যে প্রাক্তন সভ্যদের একটি নিয়মিত সাপ্তাহিক অধিবেশন সুরু হয়। প্রবীণ সদস্যেরা তাঁদের লিখিত দিনপঞ্জী দেখে ও স্মৃতি থেকে ধারাবাহিক ভাবে বলে যেতেন আর আমি লিখে নিতাম। পরে পড়ে শুনালে তাঁরা আবশ্যকমত পরিবর্তন, সংশোধন ও অনুমোদন করে দিতেন। এরই ফলশ্রুতি রূপে ১৯৫০ সালের গোড়ার দিকে প্রকাশিত হয় আমার "অনুশীলন সমিতির ইতিহাস" পুস্তকখানি। এর পরবর্তী যুগ থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত অবশ্য সরকারী এবং বেসরকারী উদ্যোগে ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস এবং এমন কি অনুশীলন সমিতির উপরেও বিস্তর গবেষণা ও

পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে ; স্বদেশে এবং বিদেশে সর্বত্রই। আমার লেখা "অনুশীলন সমিতির ইতিহাস" বইখানা হাতে পাওয়ার পর ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশ চন্দ্র মজুমদার একটি ক্ষুদ্র ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন যা পরে বইটির ভেতর সংযোজিত করা হয়েছিল তাও বর্তমান গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হল পাঠকের অবগতির জন্যে।

যে বঙ্গভঙ্গকে উপলক্ষ করে ১৯০৫-এ জাতীয় চেতনার জাগরণ ; সেই বাংলা এবং সমস্ত ভারতকে স্বেচ্ছায় ভাগ করা হল ১৯৪৭ সালে গুটিকয়েক মানুষের স্বার্থের যূপকাষ্ঠে কয়েক কোটি মানুষের অনিচ্ছা ও স্বার্থকে বলিদান করে। সেই ভারত ব্যবচ্ছেদের রক্তমোক্ষণ আজও সমানে অব্যাহত। অযুত লক্ষ মানুষ আজ নিজ মাতৃভূমিতে বাস করেও বিদেশী হয়ে গেল।

সম্প্রতি মওলানা আজাদের লেখা 'ইণ্ডিয়া উইন্‌স্ ফ্রিডম' বইটির এতাবৎকাল অপ্রকাশিত পরিচ্ছেদগুলি সহ সম্পূর্ণ বইটি পুনঃ প্রকাশিত হয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আজ অনেকের মনেই প্রশ্ন— সেদিনের দেশ বিভাগের প্রেক্ষাপটটি ঠিক কি ছিল এবং এর দায়িত্বই বা মূলত কার বা কাদের ছিল! একথা এখন শিশুরাও জানে ভারত শাসনের দর কষাকষিতে সেদিন আলোচনার টেবিলে ইংরেজ সরকারের প্রতিপক্ষের ভূমিকায় কেবল গান্ধীজি, জহরলাল নেহরু, বল্লভভাই প্যাটেল, মওলানা আজাদ প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দই প্রধানত ছিলেন। এবং ভারত ভাগের প্রস্তাব নেহরু এবং প্যাটেলের তরফ থেকে হলেও গান্ধীজিও এর জন্যে কম দায়ী ছিলেন না। মুসলিম লীগের ভূমিকাটি ছিল অত্যন্ত গৌণ, কারণ তা প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ সরকারেরই আশ্রয়পুষ্ট ছিল।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী রামসে ম্যাকডোনাল্ডের কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড বা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে গান্ধীজির পরোক্ষ স্বীকৃতিই (১৯৩৫) সেদিন ভারতভাগের বীজ রোপণ করেছিল। একদিকে তৎকালীন চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর রাজনৈতিক ভাগ্য ও আর একদিকে তাঁরা

অহিংস অসহযোগ নীতির এক্স্‌পেরিমেণ্ট এই নিয়ে গান্ধীজি সেদিন ছেলেখেলাই করেছেন বললে একটুও অত্যুক্তি হয় না। এর সাক্ষী আজকের ইতিহাস। "দেশভাগ যদি হয় তো তা হবে আমার মৃতদেহের ওপর"। কোথায় ছিল গান্ধীজির এই প্রতিশ্রুতি শেষ পর্যন্ত? সত্যিই যদি তিনি দেশ বিভাগের বিরোধী হতেন তা হলে নেহরু প্যাটেলের মতের বিপক্ষে সেদিন জনমত গঠন করেন নি কেন? কোথাও কোন প্রকাশ্য বিবৃতিও দেন নি কেন! একদিনের জন্যও অনশন করেন নি কেন? কথায় কথায় অজস্র অনশনের এক্স্‌পেরিমেণ্ট তিনি করেছেন। ভারত ভাগের পরেও পাকিস্থানকে দেয় প্রাপ্য নিয়ে তিনি অনেক নাটক করেছেন। গান্ধীজি সেদিন শেষ পর্যন্ত নেহরু প্যাটেলের প্রস্তাবই সমর্থন করেছিলেন। ভারতের ভাগ্যাকাশে নেহরুকে তুলে ধরার উদগ্র আগ্রহে তিনি একদিন অন্যায়-ভাবে সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত করতে দ্বিধাবোধ করেন নি একটুও (১৯৩৯)। নেহরুর দুর্বলচিত্ততা, রাজনীতিতে অপরি-পক্বতা ও অসাধারণ ক্ষমতা লিপ্সার কথা গান্ধীজির অজানা ছিল না। ইংরেজ সরকারও এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাঁরা অনেক বেশী ভয় পেতেন সুভাষকে এবং সুভাষের কর্মপদ্ধতিকে। সুভাষ ও তাঁর গঠিত জাতিধর্ম নিরপেক্ষ সম্মিলিত ভারতীয় আজাদহিন্দ ফৌজ বৃটিশ সরকারের নিদ্রা হরণ করে নিয়েছিল। আজাদহিন্দ ফৌজের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এর পরই হল বোম্বাইতে নৌসেনা বিদ্রোহ।

কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ বিদ্রোহী নৌসেনাদের অভয় দিয়ে আন্দোলন বন্ধ করতে নির্দেশ দিলেন এবং পরে বিচারের প্রহসন করে যখন তাদের ফাঁসি দেওয়া হল তখন তাঁদের কেউই এগিয়ে এসে মুখ খোলার প্রয়োজন বোধ করেন নি।

এদিকে আজাদহিন্দ ফৌজের বিচারের প্রহসনও লাল কেল্লায় আরম্ভ হল। সমস্ত ভারত ব্যাপী গ্রামে গঞ্জে, শহরে, পথে ঘাটে সে কি

প্রচণ্ড আলোড়ন ও উত্তেজনা নেতাজী সুভাষ ও তাঁর বীর সেনানীদের কেন্দ্র করে। কংগ্রেসী নেতাদের অহিংস আন্দোলন ও রাজনীতি দেশের তাবৎ মানুষের মন থেকে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল। জাতীয় শ্লোগানই হল—জয় হিন্দ। আন্দোলনের সঙ্গীত হল—কদম কদম বাড়ায়ে যা···। সমসাময়িককালে বৃটিশ রাজনীতিকেরা এই পরিস্থিতির কি ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তার আভাষ নিচের দুজনের বক্তব্যে যথেষ্ট বোঝা যাবে।

…"There can thus be little doubt that the Indian National Army, not in its unhappy career on the battle field, but in its thunderous disintegration, hastened the end of British rule in India."

—Hugh Toye

…"The ghost of Subhas Bose, like Hamlet's father, walked the battlements of the Red Fort, and his suddenly amplified figure overawed the conferences that were to lead to independence ·· India owes more to him than to any other man."

—Michael Edwards

আত্মসম্মান বজায় রেখে এদেশ ছেড়ে যাওয়ার আর কোন রাস্তা সেদিন বৃটিশ সরকারের কাছে খোলা ছিল না। তাই বৃটিশ গোয়েন্দা দফতর সেদিন হাতিয়ার হিসেবে বেছে নেন গান্ধীর প্রিয়পাত্র নেহরুকে। সে কারণেই লর্ড ওয়াভেলের পরামর্শ ক্রমে দূত হিসাবে নেহরুকে সিঙ্গাপুরে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের আতিথ্য গ্রহণ করতে পাঠানো হয়েছিল (১৮ই মার্চ ১৯৪২)। সিঙ্গাপুরে পৌঁছে মাউন্টব্যাটেনের নির্দেশ মতই নেহরু আজাদহিন্দ ফৌজের সামরিক স্মৃতি সৌধে মালা দেওয়ার সৌজন্যটুকুও দেখাতে অস্বীকার করেন।

শোনা যায় সিঙ্গাপুরে মাউন্টব্যাটেন নেহরুকে তুটি বিশেষ প্রশ্ন করেছিলেন। একটি হল—বৃটিশ গোয়েন্দা দফতর স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড সুভাষের মৃত্যু সম্পর্কে কোন প্রমাণিত তথ্যই সংগ্রহ করতে পারে নি। যদি সুভাষ ভারতে ফিরে আসেন তবে ভারতের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী কে হবেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল—যদি ভারতভাগ না মেনে নেওয়া হয় তা হলে প্রধানমন্ত্রী ভারতের কোন প্রদেশ থেকে নির্বাচিত হবেন। অবিভক্ত বাংলাদেশ থেকে না হিন্দীভাষী উত্তর প্রদেশ থেকে!

দেশ বিভাগে রাজী হতে নেহরুকে এর পর দ্বিতীয়বার চিন্তা করতে হয় নি।

গভীর পরিতাপের বিষয় যে উত্তর স্বাধীনতা যুগে দিল্লী এবং উত্তর ভারতের অন্যত্র অনেক গ্রন্থকার এবং প্রকাশকই ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাস এর ওপর নানান গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন এবং করছেন যাতে বাঙ্গালী রাজনৈতিক নেতা বা অগ্নিযুগের বাঙ্গালী বিপ্লবীদের কোন উল্লেখই নেই। এমনকি রাসবিহারী বসু বা নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নামও নেই। বস্তুতঃ এইসব বই পাঠ্য পুস্তকের তালিকায় অনুমোদিত হয়েছে এবং স্কুল কলেজে পড়ানো হচ্ছে। বাংলা সংবাদ পত্র পত্রিকায় এর কিছু প্রতিবাদ অবশ্য করা হয়েছে।

এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ভারতের নবজাগরণে বাংলার অবদান তথা স্বাধীনতা সংগ্রামে বীর বাঙালী যুবকদের আত্মদানের কাহিনী একেবারে মুছে ফেলবার একটা গভীর চক্রান্ত চলছে।

এই সব খবর বিপ্লবী নেতা যাতুগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গোচরে এসেছিল। এতে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন এবং কি উপায়ে এর স্থায়ী প্রতিকার হতে পারে তার চেষ্টা করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে এর পটভূমি আলোচনা করলে আমার বক্তব্য পরিষ্কার হবে—

স্বাধীনতা লাভের পর প্রধানমন্ত্রী নেহরুর জীবদ্দশায় ভারতের

স্বাধীনতার একখানি বিশদ্ ইতিহাস রচনার আয়োজন হয়। সেই উদ্দেশ্যে দিল্লীর ঐতিহাসিক ডঃ তারাচাঁদের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এতে বাংলার দুজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিককে আহ্বান করা হয়—ডঃ সুরেন সেন ও ডঃ রমেশ মজুমদার।

অনুশীলন সমিতির ইতিহাস লেখক হিসাবে এবং বিপ্লবী দলের সহিত যোগসূত্রে আমি উভয়ের সংস্পর্শেই আসি।

ডঃ মজুমদারের নিকট শুনেছি—এই ইতিহাস লেখার রচনা পদ্ধতি ও বিষয়বস্তু স্থির করবার উদ্দেশ্যে রাজধানীতে কয়েকবার কমিটি-মিটিং হয়। তাতে উচ্চ পর্যায় হতে নির্দেশ আসে যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস গান্ধীজী কর্তৃক পরিচালিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলন হতেই আরম্ভ—একথা লিখতে হবে। তার আগে বাংলার বিপ্লববাদের কোন উল্লেখ করা চলবে না।

তাতে ডঃ মজুমদার আপত্তি করেন : বলেন **As a historian, how can I ignore an established fact ?** ডঃ সেনও অনুরূপ মন্তব্য করেন এবং উভয়েই একযোগে দিল্লীর সেই কমিটি থেকে ইস্তফা দিয়ে চলে আসেন। এবং বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টার সত্যনিষ্ঠ ইতিহাস লেখবার সংকল্প করেন। পরিতাপের বিষয় ডঃ সেন এই ঘটনার অল্পকাল পরেই পরলোক গমন করেন।

ডঃ মজুমদার ফিরে এসে কঠোর পরিশ্রম করে ইংরাজীতে **History of Freedom Movement in India** বইখানি লেখেন। তাতে তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টার যথাযোগ্য মর্যাদা দান করেছেন এবং বাঙ্গালী বিপ্লবীদের আত্মোৎসর্গের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

ইতিমধ্যে যাদুগোপাল বাবু তাঁর "বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি" বইখানি প্রকাশ করেন। বলা বাহুল্য এই গ্রন্থ বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টার ও বাঙ্গালী বিপ্লবীদের একটি প্রামাণ্য ইতিহাস। আমারই পরামর্শমত

যাদুবাবুর একখানি বই ডঃ মজুমদারকে পাঠানো হয়। তখন তিনি নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর।

এই বইখানি পাঠ করে রমেশবাবু যাদুদাকে চিঠি লেখেন—

"আপনারা আজীবন যে ব্রত পালন করিয়াছেন তাহা অপেক্ষা মহত্তর ব্রত সাংসারিক জীবনে আর কিছু নাই। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আপনাদের স্থান কোথায় আশা করি দেশবাসী একদিন তাহা বুঝিতে পারিবে।……আপনার এই গ্রন্থখানি পড়িয়াও অনেক নূতন তথ্য জানিতে পারিলাম। আপনার ও আপনার সহযোগীদের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা বহুকাল হইতেই মনে মনে পোষণ করিয়াছি। আপনাদের আদর্শ ও ত্যাগের কাহিনী যাহাতে দেশের চিরন্তন সম্পদ হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে স্বাধীনতার ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

বুড়ী বালামের তীরে যে সমুদয় ভক্ত দেহের রক্ত-লহরী মুক্ত হইয়াছিল—তাঁহাদের প্রতি আপনি যে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছেন তাহা পড়িয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি। আশা করি এদেশ একদিন তাঁহাদের মূল্য বুঝিবে এবং তাঁহাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবে। তাঁহাদের জীবন্ত প্রতীক হিসাবে আমি আপনাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতেছি। …আপনি এই বৃহৎ গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন তাহার জন্য আপনি সমগ্র দেশের অশেষ ধন্যবাদের পাত্র।"

এই সূত্রে যাদুদা আমায় চিঠি লেখেন ঃ—

"জীবনতারা, নাগপুর থেকে রমেশ মজুমদার মশায় একটি সুন্দর পত্র লিখেছেন। এজন্য সমস্ত প্রশংসা তোমার প্রাপ্য।"

এইখানে বলে রাখি যে সেই সময়ে যাদুদা ১০।১৫ দিনের জন্য কলকাতায় আসেন ও বিপ্লবী কালীচরণ ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে থাকেন। আমি সেই খবর রমেশবাবুকে জানাই ও তাঁকে সঙ্গে করে যাদুদার সহিত পরিচয় করিয়ে দিই। তাতে তিনি অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করেন।

এ ঘটনার অব্যবহিত পরে রমেশবাবু তাঁর লেখা ইংরাজী ইতিহাস-খানি যাদুবাবুকে উপহার দেন। তা পাঠ করে যাদুবাবু আমাকে চিঠি লিখে জানান—

"জীবনতারা, আমাদের কর্তব্য সম্পন্ন হয়েছে। দেশব্যাপী কিছু পদস্থ লোকের ষড়যন্ত্র বিচ্ছিন্ন হয়েছে। রমেশবাবুর মত বিখ্যাত ঐতিহাসিক যে তথ্য ও তত্ত্ব সকলের কাছে খুলে ধরেছেন তাকে আর কেউ চেপে মারতে পারবে না। সত্যমেব জয়তে।"

যাই হোক অবশেষে সত্যেরই জয় হয়েছে। ভবিষ্যৎ-বংশীয়দের জন্য বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টার সত্যনিষ্ঠ ইতিহাস নিশ্চয়ই আবশ্যক ছিল।

এখন মূল আলোচনার বিষয় বস্তুতে ফিরে যাওয়া যাক। ১৯৮৯ খৃস্টাব্দের চৌকাঠ ডিঙিয়ে এসে আমার এই সাতানব্বই বছর বয়সেও (আমার জন্ম ১৮ই জুলাই ১৮৯৩ খৃঃ) আজ ১৯০৫ এর স্মৃতি ফিরে পেতে অন্ধকার হাতড়াতে হয় না একটুও। ১৯০৫ এর মূল্য বাংলার ইতিহাসে অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ। ১৯০৫ গৌরবময় বঙ্গ বিপ্লবের সূচনা করেছিল সেদিন। সমগ্র ভারত মহাদেশে এই প্রথম সত্যিকার জাতীয় রাজনৈতিক চেতনা ও জনজাগরণের উন্মেষ হল। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর পাশ্চাত্য বিজয় দিয়ে এ জাগরণের ভিত্তি মাত্র কিছুদিন আগেই সুদৃঢ় পাদপীঠের ওপর মজবুত হাতে গেঁথেদিয়েছেন। সমস্ত দেশ ব্যেপে যে আলোড়নের ঢেউ ১৯০৫ এ সেদিন উঠেছিল তার ব্যাপ্তি হয়েছিল এতই সুদূর প্রসারী যে পাঁচ বছরের শিশুওসে উন্মাদনার স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয় নি। আমার বয়সও তখন ঐ রকমই ছিল।

আমাদের বর্তমান বাসগৃহ যা উত্তরাধিকার সূত্রে দু'শ বছরেরও বেশী আমাদের পৈতৃক বাস্তুভিটা তো বটেই; তার বর্তমান ঠিকানা ১২।১।১এ সুধীর চ্যাটার্জি স্ট্রীট হলেও এই রাস্তাটার পূর্বনাম ছিল জেলিয়াটোলা স্ট্রীট। মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে দর্জিপাড়ার অন্তর্গত। দর্জিপাড়া উত্তর কলকাতায় অনেকদিক দিয়েই একটি নামকরা অঞ্চল ছিল।

বরাবরই। ভালো এবং মন্দ দু কাজের দিক দিয়েই। ডানপিটেমি এ পাড়ার ছেলেদের মজ্জাগত ছিল চিরদিন। অতি নিকটেই সিমলে অঞ্চল যেখানকার বিখ্যাত ডানপিটে ছেলে ছিলেন একদা নরেন দত্ত (উত্তর কালে স্বামী বিবেকানন্দ), সুরেশ মিত্র প্রভৃতিরা। ডন, কুস্তি, লাঠিখেলা ইত্যাদি শরীর চর্চার আখড়া চালানো থেকে আরম্ভ করে মড়া পোড়ানোর দল যোগার করা সব তাতেই এদের সমান উৎসাহ ছিল। সুতরাং বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনের বিশাল ঢেউ এ পাড়ার যুব-মানসেও কম আলোড়ন সৃষ্টি করেনি। এই পরিমণ্ডলে মানুষ হয়ে ছোটবেলা থেকেই আমিও পাড়ার আরও অনেকের মতই সক্রিয়ভাবে সব কিছু আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি।

সে আমার কৈশোর কালের কথা। বোধহয় বছর বারো বয়স হবে তখন। আমার উপর ভার ছিল পাড়ার চারদিকে টহল দিয়ে নজর রাখা পুলিশের বা অপর কোন সন্দেহভাজন লোক এ অঞ্চলে ঘোরাফেরা করছে কি না। পাড়া বলতে তখন অবশ্য ছিল অজস্র গলি খুঁজির গোলক ধাঁধা। আজকের বিখ্যাত সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউ তখন কোথায়! তার জন্মই হয়নি সেদিন। গোপনে আমদানী গুলি, বারুদ, কার্তুজ, পিস্তল, রিভলবার প্রভৃতি তখন দিকে দিকে পাচার করার কাজে পাড়ার ঈষৎ বয়োজ্যেষ্ঠরা অতিশয় সক্রিয়।

গোড়ার কথায় ফিরে যাওয়া যাক এখন কিছুটা। বিশ্বজয়ী স্বামী বিবেকানন্দের মানুষ গড়ার ডাকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে যে কজন প্রথম এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে দুজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের একজন হলেন স্বনামধন্য সংগঠক সতীশ চন্দ্র বসু। অনুশীলন সমিতির আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে কারও নাম করতে গেলে সতীশচন্দ্রের নামই প্রথমে করতে হয়। আর ঠিক একই সময়ে বাংলাদেশের আর এক জায়গায় এই একই কারণ নিয়ে নীরবে মানুষ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন আর এক মহাপুরুষ। তিনি হলেন বর্ধমান জেলার অন্তর্গত

চান্না গ্রামের যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই যতীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে সোঽহম্ স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে নিরালম্ব স্বামী নামে পরিচিত হন। এই নিরালম্ব স্বামীই বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লববাদের প্রথম প্রবর্তক বলে স্বীকৃত। ইনি আনুমানিক ১৯০২ সালেই এই কাজের জন্যে একটি গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। উপযুক্ত কর্মীসংগঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন স্থানে শরীর চর্চার জন্যে ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠার আড়ালে গুপ্ত সমিতির আখড়া খোলার ব্যবস্থা যতীন্দ্রনাথই সুরু করেন। স্পষ্টতঃ ব্যায়মাগার গুলো ছিল বাইরের একটা ছদ্ম পরিচয় মাত্র। এই যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বা স্বামী নিরালম্বই হলেন বাংলায় অগ্নিযুগের ব্রহ্মা প্রপিতামহ।

আমার পরম সৌভাগ্য যতীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম। ওঁর চান্না গ্রামের আশ্রমে আমি প্রায়ই যাতায়াত করতাম। আশ্রমের পাশ দিয়েই বয়ে যেত খড়ি নামে একটি ছোট্ট নদী। খান তিনেক কুঁড়ে ঘর ছিল আশ্রমে। একটি ছিল যতীন্দ্রনাথের নিজের ব্যবহারের জন্যে নির্দিষ্ট। আর একটি অসংখ্য শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলীর রাত্রিবাসের জন্যে এবং তৃতীয়টি ছিল সার্বজনীন পাকশালা। কয়েকটি গাভী ছিল আশ্রমে। তাদের দুধ অতিথি বা শিষ্যদের সেবার কাজেই বেশী ব্যয় হত। রান্নার কাজে আমার কিছু হাতযশ ছিল। বেশ কয়েকবার আশ্রমের দুধ থেকে নানারকম মিষ্টান্ন ইত্যাদি তৈরী করে স্বামীজি ও অন্যান্য সবাইকে খাওয়াবার সৌভাগ্য লাভ করেছি। রীতিমত বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় (!) সাইট্রিক অ্যাসিড দিয়ে ছানা কাটান হত দুধ থেকে। আজকের দিনে সবাই হয়তো একথা শুনে মজা পাবে কিন্তু সে যুগে এটা একটা নতুনত্ব ছিল। যতীন্দ্রনাথ আমাকে খুবই স্নেহ করতেন।

অগ্নিযুগের আর এক স্বনামধন্য ও ঐতিহাসিক চরিত্র ছিলেন ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্র। তিনি বিলাতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবার জন্যে যান অতি অল্প বয়সেই। ছাত্র হিসাবে বিলাতে থাকার

সময়েই তিনি ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার মন্ত্র ও ভাবধারায় গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হন। দেশে ফেরার কিছুকালের মধ্যেই যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। এই যোগাযোগ সোনায় সোহাগা মিলনের মতই কাজ করে। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (পরবর্তী কালে এম এন রায়) এবং বিখ্যাত বাগ্মী বিপিন চন্দ্র পালের সঙ্গেও প্রমথনাথের ঘনিষ্ঠতা হয়। সকলেরই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল একই— দেশের যুবশক্তিকে স্বদেশ প্রীতির মন্ত্রে দীক্ষা দান এবং ক্ষাত্রধর্মে উদ্বুদ্ধ করে পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করা। এই প্রয়োজনেই দেশের বিভিন্ন স্থানে শরীর চর্চার আখড়া খোলা হয় এবং নানা বিদেশ (বিশেষভাবে জার্মানী) থেকে অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করে সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে নদীপথে দেশের বিভিন্ন গুপ্ত কেন্দ্রে পাচার করা এবং বিপ্লবী সদস্যদের মধ্যে বিলি করার ব্যবস্থা করা হয়। আমাদের দর্জি পাড়ায় ১ নম্বর ছিদাম মুদি লেনে এই রকম একটি অস্ত্র গুদাম ছিল। অস্ত্রের বাক্সগুলির উপর বিলাতী রডা কম্পানীর নাম লেখা থাকত। বিপ্লবী দলের ছেলেরা এগুলি গোপনে সরিয়ে ফেলে আড্ডায় নিয়ে আসত। এই ব্যাপারে অবাঙ্গালা ব্যবসায়ী পরিবারের ছেলেরাও অনেকেই সাহায্য করত। এঁদের মধ্যে স্বনামখ্যাত শ্রীপ্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকার নাম অগ্রগণ্য।

এইভাবে বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করার আয়োজনে যাঁরা হোতা ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন ডাক্তার যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় ও নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (পরবর্তী কালে এম এন রায়)। এর পরবর্তী দশকে সমস্ত ইউরোপ জুড়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডব সুরু হয়ে যায়। বিপ্লবী নেতারা সেই সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করেন। সেই কর্মযজ্ঞের পূর্ণ বিবরণ যাদুগোপাল তাঁর "বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি" নামক গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন। আর ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এর **History of Freedom Movement in India** তো একটি পূর্ণাঙ্গ প্রামাণ্য ঐতিহাসিক দলিল।

অনুশীলন সমিতির ইতিহাস

বাংলার জাতীয় জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যে অনুশীলন সমিতি এক বিস্ময়কর নবযুগের সূচনা করেছিল, জন্মভূমির মুক্তিকল্পে যে সমিতি বাংলার যুবসমাজকে পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের অভূতপূর্ব প্রেরণা ও নির্দেশ দিয়েছিল, যে সমিতির স্বতন্ত্র চিন্তাধারা ও নিজস্ব কর্মপদ্ধতি পরবর্তী কালে সমগ্র ভারতবর্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামের পথ সুগম করেছিল ও স্বাধীনতা লাভ সম্ভবপর করেছিল—তারই রোমাঞ্চকর কাহিনী উদ্‌ঘাটন করবার সুযোগ আজ উপস্থিত হয়েছে।

নানা কারণে এ যাবৎ সমিতির ইতিহাস জনসাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করা সম্ভবপর হয় নি।

যে সমিতির উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলার যুবক সম্প্রদায় স্বাধীনতা সংগ্রামে অকাতরে আত্মাহুতি দিয়েছিল, বাংলার অগ্নিযুগে যে সমিতির প্রবল প্রতাপে তদানীন্তন বৈদেশিক শাসকবর্গ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল, সেই সমিতির অপরূপ প্রেরণা যুগে যুগে যুবক সম্প্রদায়কে নূতন নূতন উদ্দীপনা যোগাবে।

অনুশীলন সমিতির ইতিহাস বর্ণনার প্রারম্ভে এর প্রতিষ্ঠাতা, সংগঠক ও কর্মসচিব সতীশচন্দ্র বসুর কিছু পরিচয় অপরিহার্য। কারণ এর সঙ্গে তিনি ওতঃপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, সমিতিই তাঁহার প্রাণ ছিল। বিগত শতাব্দীতে বাংলাদেশে যে সকল মনীষী জন্মগ্রহণ করে বঙ্গজননীর মুখোজ্জ্বল করেছেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁদের অসামান্য অবদান বাঙ্গালী জাতির গৌরব বৃদ্ধি করেছে, তাঁদেরই সঙ্গে তিনি স্থান পাবার যোগ্য। সমাজ সংস্কারে রাজা রামমোহন, ধর্ম প্রবর্ত্তনে স্বামী বিবেকানন্দ, শিক্ষা বিস্তারে ঈশ্বরচন্দ্র, সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র, কাব্যে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ যে প্রেরণা দিয়েছিলেন, বাঙ্গালীর শক্তি সাধনায় সতীশচন্দ্রও

সেই প্রেরণা দিয়েছিলেন। দুর্বলতার অপবাদ ঘুচিয়ে, বাঙ্গালীকে শক্তিশালী করতে হবে—এই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই সতীশচন্দ্র কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং এটাকেই তাঁর জীবনের ব্রত করেন। তাঁর সাধনা কি পরিমাণ সিদ্ধিলাভ করেছিল তা অনুশীলন সমিতির ধারাবাহিক ইতিহাসে প্রমাণিত হয়।

বাংলার তথা ভারতের নব জাগরণের প্রস্তুতিতে যে কয়জন কালজয়ী মহাপুরুষের অবদান অনস্বীকার্য তাঁদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ অগ্রগণ্য। ইং ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে যুগস্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার শিকাগো শহরে বিশ্বধর্ম সম্মেলনে উদাত্তকণ্ঠে ভারতের সুমহান ঐতিহ্য প্রচার করে সর্বপ্রথম এদেশের প্রতি পাশ্চাত্য জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। প্রত্যাবর্তনের পর তিনি সমগ্র জাতিকে মনুষ্যত্বলাভের জন্য তপস্যা করতে আহ্বান জানালেন। তিনি নির্বীর্য দেশবাসীকে উদ্দেশ করে বললেন—

"হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই ; বল, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই ; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশু-শয্যা, আমার যৌবনের উপবন আমার বার্ধক্যের বারাণসী। বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ। আর বল দিনরাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও ; মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

অপরদিকে সত্যদ্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস আকারে "আনন্দমঠ" লিখে বঙ্গজননীর শৃঙ্খল মোচনে ভবিষ্যৎ বিপ্লব আয়োজনের সঙ্কেত জানালেন এবং দেশমাতৃকার আরাধনায় "বন্দে মাতরম্" বীজমন্ত্রে সমগ্র জাতির মধ্যে তেজ ও শক্তি সঞ্চারণ করলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ জগন্মাতার নিকটে বাঙ্গালী জাতিকে মানুষ

করবার যে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন—সতীশচন্দ্র সেই কর্মভার গ্রহণ করেন। এতেই তাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য"—এই উক্তির সারমর্ম তিনি সম্যক উপলব্ধি করেন এবং এই মন্ত্র সাধনের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন। বাঙ্গালী জাতিকে শৌর্যে বীর্যে সর্বাঙ্গসুন্দর করতে হবে, বাঙ্গালী জাতি সকল বিষয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করবে—এটাই ছিল তাঁর পরিকল্পনা। এই উদ্দেশ্য সফল করবার জন্যে তিনি সুযোগ অন্বেষণ ও সর্ববিধ প্রয়াস করতে লাগলেন। অবশ্য প্রথমে মাত্র শরীরচর্চার বীজ বপন করে কার্য আরম্ভ হয়, পরে তা হতেই বিশাল মহীরুহ উৎপন্ন হয়ে ক্রমশঃ পল্লবিত ও ফলফুলে সুশোভিত হয়ে দিকে দিকে বিস্তার লাভ করে।

১৯০০ সালের বহু পূর্বের কথা। সে কালে "ভীরু-কাপুরুষ" বাঙালীকে সকলেই ঘৃণা করত। এই কলঙ্ক মোচনের জন্যে কলকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বিভিন্ন স্থানে "আখড়া" স্থাপন করেছিলেন। তাতে প্রধানত ডন, বৈঠক, মুগুর, কুস্তি প্রভৃতি ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হত। বিডন স্ট্রীটের ছাতুবাবু, লাটুবাবু, দর্জিপাড়ার অম্বু গুহ এবং তাঁর পুত্র ক্ষেতু গুহ কুস্তিতে বিখ্যাত ছিলেন। তখনও মধ্যবিত্ত ভদ্র সম্প্রদায় এই সব আখড়াকে হেয় জ্ঞান করতেন। এগুলি কেবলমাত্র কুলি মজুর, চাকর দরওয়ানদের জন্যে—ভদ্রলোকের জন্যে নয়—এই ছিল সাধারণ ধারণা। হার্মষ্টোন সার্কাস প্রভৃতির দুঃসাহসিক বীরত্ব-ব্যঞ্জক ক্রীড়াকৌশল দেখে প্রথম বাঙ্গালী যুবক শারীরিক চর্চায় মন সন্নিবেশ করল। তার ফলে জিম্‌নাষ্টিকের দল পাড়ায় পাড়ায় গড়ে উঠল। এই বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন গোর মুখার্জী, নারাণ বসাক প্রভৃতি। এই সঙ্গে রাধিকামোহন রায় মহাশয়ের **Friends United Club**ও উল্লেখযোগ্য।*

* এটা অনুশীলন সমিতির কিছুকাল পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তারকনাথ দাস ও যতীন্দ্রনাথ শেঠ এর প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট সহায়তা করেন।

এই শক্তিচর্চার অন্যতম অঙ্গ হিসাবে বাঙ্গালীর কয়েকটি সার্কাস পার্টিও পরিচালিত হত। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাঘমারা শ্যামাকান্ত (সোঽহং স্বামী), প্রোফেসর বোস, কৃষ্ণ বসাক (**Hippodrome Circus**) প্রভৃতি। তাঁরা দেশবিদেশে নানারূপ ক্রীড়াকৌশল দেখিয়ে যথেষ্ট খ্যাতি ও সুনাম অর্জন করেছিলেন।

যৌবনকালে সতীশচন্দ্র বিখ্যাত **General Assembly's Institution** (হেদুয়া পুষ্করিণীর পূর্বদিকে অধুনা **Scottish Church College**) কলেজে পাঠ করতেন। ঐ কলেজ প্রাঙ্গণে তিনি একটি ব্যায়ামাগার খোলেন এবং নানা শক্তিক্রীড়া শিক্ষার বন্দোবস্ত করেন। গৌরহরি মুখার্জীর অধীনে বহু কলেজে ঐরকম ব্যায়ামচর্চার ব্যবস্থা তখন হয়েছিল। সতীশবাবু গৌরবাবুর ব্যায়াম-শিষ্য ছিলেন।

বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে খৃষ্টান মিশন ও কলেজের প্রভাবও সুবিদিত। এটা অবশ্য স্বীকার্য যে তাঁরা এই দেশের সকল প্রকার জনহিতকর কাজেই উৎসাহ দিতেন। সতীশচন্দ্রের জাতিগঠনমূলক কাজেও কলেজে কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট সাহায্য ও সহযোগিতা করেছিলেন। বিশেষত এই কাজের জন্যে সতীশচন্দ্র প্রিন্সিপ্যাল **Wann** সাহেবের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠে ছিলেন। এইভাবে ছাত্রমহলেও তাঁর প্রতিপত্তি বাড়তে লাগল। এ প্রায় ১৯০১ সালের কথা। এই ব্যায়ামাগারটি পরে অনুশীলন সমিতির একটি কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়।

১৯০২ সালে দোল পূর্ণিমার দিন, বাংলা ১০ই চৈত্র, ১৩০৮ সাল, সোমবার, ইংরেজী ২৪শে মার্চ, ১৯০২ খৃঃ, কলকাতায় প্রথম অনুশীলন সমিতি স্থাপিত হয়। হেদুয়ার নিকটবর্তী ২১নং (অধুনা ২৪নং) মদন মিত্র লেনে করা হল এর জন্যে ব্যায়ামক্ষেত্র এবং তারই কাছে একটা ছোট বাড়ীতে কার্যালয় স্থাপিত হল। পরে ১৯০৫ সালে ঐ অফিস **Oxford Mission**-এর উত্তরে)—৪৯নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে স্থানান্তরিত হল। সংক্ষেপে সকলে একে "**Forty-nine**" বলত। সভ্যদের

কেন্দ্রে মিলিত হবার এটাই ছিল সহজ সঙ্কেত।

স্মরণ রাখতে হবে জাতীয় জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে অনুশীলন সমিতির উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন তত্ত্বে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সমন্বিত আদর্শ মানব গঠনের যে নির্দেশ আছে—তাই হল অনুশীলন সমিতির ভিত্তি। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্বের শেষ উপদেশ, "সকল ধর্মের উপর স্বদেশপ্রীতি, ইহা বিস্মৃত হইও না", সমিতির মূল প্রেরণা যুগিয়েছিল। যতদূর জানা যায় নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলের প্রধান শিক্ষক নরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য মশাই এই সঙ্ঘের নামকরণ করেন "ভারত অনুশীলন সমিতি"। পরে পি. মিত্র মশাই একে সংক্ষেপে "অনুশীলন সমিতি" করেন।

খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার পি মিত্র (প্রমথনাথ মিত্র) পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের প্রকৃষ্ট উপায় হিসেবে বাঙ্গালীর শক্তিচর্চার আবশ্যকতা অনুভব করেছিলেন। সরলা দেবীচৌধুরাণীও এই উদ্দেশ্যে বীরাষ্টমী ব্রত প্রবর্তন করেছিলেন এবং স্বয়ং বীরাঙ্গনার বেশে ক্রীড়া দেখিয়ে দর্শকদের মোহিত করতেন। পি. মিত্র মশাই বিদেশ থেকে ফিরে এসে স্বজাতিকে পাশ্চাত্য জাতিদের সমকক্ষ করতে চেষ্টিত হলেন। সোদপুরের শশীদা (শশীভূষণ রায়চৌধুরী) মিত্তির সাহেবকে সমিতিতে আনেন। সেটা ১৯০২-৩ সালের ঘটনা। পি মিত্র মশাই সতীশচন্দ্রের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পান ও তাঁর নানারকম সদগুণে মুগ্ধ হয়ে অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন ও পরবর্তীকালে সমিতির ডিরেক্টর বা পরিচালক নির্বাচিত হন।

সমিতির পৃষ্ঠপোষক পি. মিত্র মশায়ই এই সময় থেকে আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন—পরলোকগত সুরেন হালদার, চিত্তরঞ্জন দাশ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, রজত রায়, এইচ ডি বসু প্রমুখ ব্যারিষ্টারগণ তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে সহযোগিতা করেন। এমন কি হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী রাসবিহারী ঘোষ ও বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র মশায়ও যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।



যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্মভূমির মুক্তিকল্পে শক্তিসাধনাই ছিল সে কালের যুগধর্ম। সেই কারণে ঠিক একই সময় বাংলার আর এক মহাপুরুষও বাঙালী জাতিকে বীর্যবান করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে তাঁর কথা আগেই একবার বলেছি। তাঁর নাম যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্মস্থান চান্না গ্রাম, খানা জংশন, জেলা বর্ধমান। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে তিনি স্বয়ং নিজের নাম বিকৃত করে 'যতীন্দর উপাধ্যায়' নামে বরোদা রাজ্যে সমর-কৌশল শিক্ষার জন্যে সৈন্যবিভাগে যোগদান করেন। সেখানে তখন অরবিন্দ ঘোষ (পরবর্তীকালে পূজ্যপাদ ঋষি শ্রীঅরবিন্দ) রাজসরকারে শিক্ষাবিভাগে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যতীন্দ্রনাথ অরবিন্দের সঙ্গে বিপ্লববাদের মন্ত্রণা করে কলকাতায় ফিরে আসেন, অনুমান ১৯০২ সালে এবং বিপ্লব আন্দোলন পরিচালনার জন্যে একটি গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। উপযুক্ত কর্মীগঠনের উদ্দেশ্যে তাঁরাও বাঙ্গালী যুবকদের ব্যায়ামশিক্ষার বন্দোবস্ত করতে প্রয়াসী হলেন। এর ফলে শরীরচর্চার আরও প্রচার হল। যতীন্দ্রনাথ স্বয়ং সৈনিকবেশে অশ্বারোহণ করে কলকাতা শহরের রাজপথে যুবকদের সামরিক শিক্ষার জন্যে উৎসাহিত করতেন এবং ক্ষাত্রশক্তি ভিন্ন স্বাধীনতা লাভ সম্ভব নয় এই কথা গোপনে প্রচার করতেন। যতীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে সন্ন্যাস অবলম্বন করেন, সোঽহং স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং নিরালম্ব স্বামী নামে পরিচিত হন। তিনিই বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লববাদের প্রবর্তক বলে স্বীকৃত। তিনি কাজের সুবিধা ও সহযোগিতার জন্যে এবং কর্মী সংগ্রহের জন্যে পি. মিত্র মশাই মারফৎ অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। বাঙ্গালী যুবকদের অশ্বারোহণ শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে ১০২ (১০৮?) নং আপার সার্কুলার রোডে একটি Riding Club প্রতিষ্ঠিত হল। এটির পরিচালনার ভার ছিল মন্মথ মিত্র ও দেবব্রত বসুর উপর। কিন্তু বস্তুতঃ এটা ছিল গুপ্তসমিতির একটি ছদ্মবেশ বা Camouflage—অন্তরালে বিপ্লবাত্মক কার্যসিদ্ধি হত।

তখনকার পটভূমিকায় দেখা যায় সমগ্র জাতি বৈদেশিক শাসনের

নিষ্পেষণে মৃতপ্রায়, ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতা বিনষ্টপ্রায়, জাতীয় সত্ত্বা লুপ্তপ্রায়। এই বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে অনুশীলন সমিতি কংস কারাগারে দেবকীনন্দনের মত বৃদ্ধি পেতে লাগল। প্রত্যেক সভ্যই গীতার সেই চিরন্তন ভগবদ্বাক্য স্মরণ করত—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

এবং সমিতির অধিবেশন সমূহে সমবেতভাবে নিচের এই চণ্ডামন্ত্রটি আবৃত্তি করা হত—

ইত্থং যদা যদা হি বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যারিসংক্ষয়ম॥

ভারতীয় কৃষ্টির চরম সামাজিক আদর্শ এক ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা। শ্রীকৃষ্ণ, অশোক, শিবাজী প্রভৃতি আমাদেরই পূর্বপুরুষদের প্রদর্শিত পথে বাঙ্গালী তার স্বাধীনতার প্রেরণা পেয়েছিল।

বাঙালী তার প্রেরণার আর এক উৎসের সন্ধান পেয়েছিল ভারতের পশ্চিম প্রান্তের মারাঠী দেশপ্রেমিকদের আত্মোৎসর্গের আদর্শ থেকেও! স্বাধীনতার যুদ্ধে মারাঠীদের আত্মত্যাগও বড় কম ছিল না।

সভ্যদের একমাত্র তপস্যা ছিল—

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যমে মহীম্।

অনুশীলন সমিতি সুচারুরূপে পরিচালিত হয়ে ক্রমেই জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগল। সমিতির উচ্চ আদর্শ যুবক সম্প্রদায়ের ওপর দ্রুত প্রভাব বিস্তার করতে লাগল। তাঁরা দলে দলে সভ্য হতে লাগলেন। দেশের নেতৃবৃন্দও সমিতির কার্যকলাপের প্রশংসা করতে লাগলেন, নানা প্রকারে সহানুভূতি দেখাতে এবং সহযোগিতা করতে লাগলেন! সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র প্রমুখ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সমিতির

সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বহু অনুষ্ঠানেই রবীন্দ্রনাথ স্বীয় সুললিত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে সকলকে উৎসাহিত করতেন, সিস্টার নিবেদিতা নিয়মিত তাঁদের হিতোপদেশ দিতেন। বাঙালী যুবকদের এইসব কর্মকাণ্ড ক্রমশই ইংরেজদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠল।

পরবর্তীকালে স্বাধীনতা সংগ্রামে ও জাতীয় উত্থানে অনুশীলন সমিতির অবদান বাংলার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। ১৯০৫ সালে তদানীন্তন বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বাঙালী জাতির অসাধারণ প্রতিভা ও অদ্ভুত সংগঠন শক্তি বিনষ্ট করবার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করবার এক প্রস্তাব করলেন। কিন্তু শাপে বর হল। এটাই জাতিকে সঞ্জীবনী সুধা যোগাল। বঙ্গভঙ্গ নিরোধ করবার জন্যে এক তুমুল আন্দোলন গড়ে উঠল। তারই সঙ্গে বিদেশী বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণ আন্দোলন সুরু হয়ে গেল।

সমগ্র জাতির যেন এক নব জাগরণ আরম্ভ হল। দেশাত্মবোধের বীজ বপন হল। দেশের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তপর্যন্ত অপরূপ ভাবের এক প্রবল বন্যা এল। ওজস্বিনী বাগ্মিতায় সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ জনসাধারণকে মাতিয়ে তুললেন। কণ্ঠে কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সঙ্গীত গীত হতে লাগল। সমগ্র জাতি 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রে দীক্ষিত হল। সমিতির খিদিরপুর শাখার প্রধান শিক্ষাব্রতী আশুতোষ ঘোষ ১৯০৫ সালের মাঝামাঝি প্রতাপাদিত্য উৎসব উপলক্ষে সর্বপ্রথম 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি প্রচার করেন। তাই পরে প্রত্যেক সভায় প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত এক অভূতপূর্ব উন্মাদনা আনয়ন করল। জাতীয় একতা বৃদ্ধির জন্যে ৩০শে আশ্বিন (১৩১১ সাল) রাখীবন্ধন উৎসব অনুষ্ঠিত হল। বাঙালী অনুভব করল—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"। কালক্রমে বাংলার উন্মাদনা ভারতবর্ষের সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল এবং স্বাধীনতার পথ সুগম করল। বাংলার সেই অভিনব যুগের তুলনা নেই, বাংলার যুবক সম্প্রদায় সেদিন আশ্চর্যরূপে সাড়া দিয়েছিল।

আজ থেকে চুরাশি বছর আগেরকার কথা হলেও সেদিনের স্মৃতি কি আশ্চর্যভাবে উজ্জ্বল হয়ে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। আমার এক মামা নরেন শেঠ খুব ভাল গাইতে পারতেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গে গান গেয়ে তিনি গঙ্গার ঘাটের দিকে এগোচ্ছেন। আমরাও পেছনে পেছনে গাইতে গাইতে চলেছি। গঙ্গায় স্নান করা হল সবাই মিলে। তারপর পরস্পরের হাতে রাখী বাঁধা হল। সে কি উদ্দীপনার দিন সে সব। এর পরই শুরু হল বিদেশী কাপড় চোপর বর্জনের পালা। গোল দীঘির পেছনে কৃষ্ণকুমার মিত্রের সঞ্জীবনী প্রেসের সামনে কৃষ্ণকুমার মিত্রই প্রথম বিলেতি কাপড় পোড়াবার আয়োজন করেন। তারপর দেশ জুড়ে স্বুরু হয়ে গেল সে কর্মকাণ্ড।

বাংলার স্বদেশী যুগে প্রচলিত কয়েকটি জাতীয় সঙ্গীতের নমুনা নিচে দেওয়া গেল :—

বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্য শ্যামলাং মাতরম্
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদল বারিণীং মাতরম্।

প্রায় শতাব্দী আগে কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় পরাধীনতা সম্বন্ধে চেতনা জাগাতে লিখেছিলেন—

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায় ?

তারপর কবি হেমচন্দ্রও তুর্য্যানিনাদ করলেন—

বাজ রে শিঙ্গা বাজ এই রবে—
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

কবি মনমোহন বসু আনুষঙ্গিক জাতীয় আর্থিক দুরবস্থা স্মরণ করিয়ে দিয়ে লিখলেন—

দিনের দিন, সবে দীন, ভারত হ'য়ে পরাধীন
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ
অপমানে তনু ক্ষীণ।
তাঁতী কর্মকার, করে হাহাকার
সূতা, জাঁতা টেনে অন্ন মেলা ভার।

কবি গোবিন্দচন্দ্র রায় কাতর কণ্ঠে গাইলেন—

কত কাল পরে, বল ভারত রে
দুখ-সাগর সাঁতারি পার হবে।

রবীন্দ্রনাথ দীক্ষা দিলেন—

নব বৎসরে করিলাম পণ লব স্বদেশের দীক্ষা,
তব আশ্রমে, তোমার চরণে, হে ভারত, লব শিক্ষা।
পরের ভূষণ পরের বসন,
তেয়াগিব আজ পরের অশন,
যদি হই দীন না হইব হীন, ছাড়িব পরের ভিক্ষা!

বাঙালী জাতিকে তিনি একতার মন্ত্র দিলেন—

বাঙ্গালীর প্রাণ, বাঙ্গালীর মন, বাঙ্গালীর ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক, হে ভগবান।

ভারতের মধ্যে বাংলাই প্রথম বিদেশী বর্জন (**Boycott**) ও স্বদেশী গ্রহণ নীতি গ্রহণ করে। এর ফলে দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার আরম্ভ হল ও ভারতে উৎপন্ন জিনিসের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে সুরু হল। স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারে উৎসাহ দিলেন কান্ত কবি রজনীকান্ত তাঁর বিখ্যাত গানে—

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই,
মা যে মোদের দীন দুঃখিনী তার বেশী আর সাধ্য নাই।

এদিকে মুকুন্দ দাস যাত্রার মধ্য দিয়ে ও কথক হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কথকথার দ্বারা জাতীয় চেতনা জাগাতে চেষ্টা করলেন। বিদেশী শাসককে শাসালেন—

সাবধান! সাবধান!
আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড
রুদ্র দীপ্ত মূর্তিমান।

এই অভাবনীয় সুযোগে অনুশীলন সমিতির প্রসার দ্রুত বৃদ্ধি পেতে লাগল। শুধু যে কলকাতার বিভিন্ন পল্লীতে ও উপকণ্ঠে শাখা খোলা হল তা নয়, বাংলার গ্রামে গ্রামে শাখা প্রতিষ্ঠিত হল। স্বভাবতঃই সতীশচন্দ্রের কার্যক্ষেত্র বিস্তার লাভ করল। তিনি এতেই মনপ্রাণ নিয়োজিত করলেন এবং অতীব দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে কেন্দ্র পরিচালনা করতে লাগলেন। তাঁর সংগঠন শক্তি ছিল অদ্ভুত ধরণের। কোনও কঠোর ব্যবস্থা নেই। অথচ স্নেহের বন্ধনে সকলেই আকৃষ্ট—এটাই ছিল তাঁর বিশিষ্টতা। বলা বাহুল্য একমাত্র জাতীয় ক্রীড়া সমূহই অনুষ্ঠিত হত। বিদেশী খেলা—ফুটবল, ব্যাটবল (তখনো ক্রিকেট কথাটা বিশেষ চালু হয় নি), টেনিস, ব্যাডমিণ্টন প্রভৃতি ব্যয়সাধ্য বলে বর্জন করা হত। দেশীয় খেলাই বেশী উপযোগী ও স্বাস্থ্যকর। Indoor games যথা তাস, পাশা, ক্যারম ইত্যাদি অলসতারই প্রশ্রয় দেয়। এসবের তুলনায় লাঠি ও তরবারি খেলা প্রভৃতিতে তৎপরতা ও কর্মকুশলতা দুইই বৃদ্ধি পায়।

আজকাল যেমন প্রত্যেক ক্লাব-এর নিজস্ব Uniform আছে, অনুশীলন সমিতির সে রকম ছিল না। দাদাভাই নৌরজীকে অভ্যর্থনা করে হাওড়া থেকে কলকাতায় আনবার সময় সভ্যরা মাত্র পায়ে কালো মোজা ও মাথায় সাদা উড়ানীর পাগড়ী ব্যবহার করেছিলেন। আজকাল ক্লাব ও Gymnasium পরিচালনায় অযথা ব্যয়বাহুল্য হয়, অনুশীলন সমিতির সময় সে রকম ছিল না।

কলকাতার প্রধান কেন্দ্রের আদর্শে শহরের বিভিন্ন পল্লীতে সমিতির

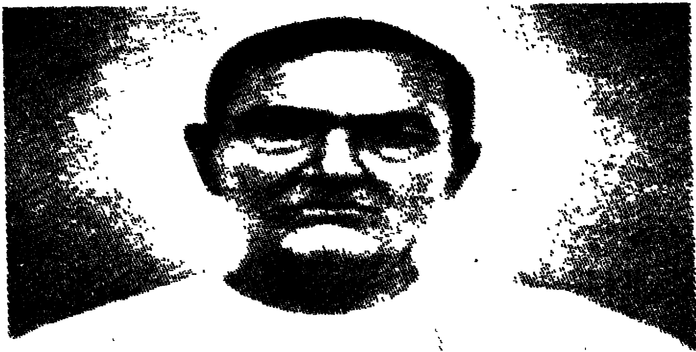
শাখা বিস্তার লাভ করতে লাগল। এদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য—দর্জিপাড়া, পটলডাঙ্গা, গ্রে স্ট্রীট, খিদিরপুর, হাওড়া, শালিখা, শিবপুর প্রভৃতি। শাখার সভ্যদের জন্য কেন্দ্রীয় সমিতি হতে শিক্ষক পাঠানো হত। তাঁরা ব্যায়ামচর্চা, লাঠিখেলা ও অসি শিক্ষা দিতেন। পরস্পরের মধ্যে খেলাধূলার প্রতিদ্বন্দ্বিতা হত। নকল যুদ্ধের অবতারণা হত। এমন কি কলকাতার সভ্যরা চন্দননগরে গিয়ে কপাটী ও হাডু-ডু-ডু খেলা প্রতিযোগিতায় যোগদান করত। ক্রমশঃ কলকাতার উপকণ্ঠেও সমিতি বিস্তার লাভ করল। বালীতে রতনমণি চট্টোপাধ্যায়, উত্তরপাড়ায় অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরামপুরে অধ্যক্ষ পঞ্চানন সিংহ ও জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, হরিপাল ও তারকেশ্বরে ডাক্তার আশুতোষ দাস সমিতি সংগঠন করেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সমিতির উদ্দেশ্য ছিল আদর্শ মানুষ তৈরী করা। শারীরিক উন্নতির জন্যে নানাবিধ ব্যায়াম—ডন, বৈঠক, কুস্তি ইত্যাদি হত। হাডু-ডু-ডু প্রভৃতি দেশীয় খেলা চলত। ক্রমে লাঠিখেলা শিক্ষা দেবার বন্দোবস্ত হল। শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র মশায় অতি নিষ্ঠার সঙ্গে বড় লাঠি খেলা শিক্ষা দিতেন।

যে লাঠির প্রশস্তি বঙ্কিমচন্দ্র একদিন করেছিলেন, "হায় লাঠি! তোমার দিন গিয়াছে! তুমি ছার বাঁশের বংশ বটে, কিন্তু শিক্ষিত হস্তে পড়িলে তুমি না পারিতে, এমন কাজ নাই। তুমি বাংলার আব্রু পর্দ্দা রাখিতে, মান রাখিতে, ধান রাখিতে, ধন রাখিতে, জন রাখিতে, সবার মন রাখিতে।" সেই লাঠিখেলা আবার জনপ্রিয় হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ছোরা খেলা, তরবারি শিক্ষা, মুষ্টিযুদ্ধ, যুযুৎসু প্রভৃতি চলতে লাগল। সামরিক কায়দায় ড্রিল ও **Mock fight** হত। কেল্লা দখলের মহড়া চলত। সংগোপনে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। নৌকা পরিচালনা, অশ্বারোহণ প্রভৃতির আয়োজন ছিল। মধ্যে মধ্যে গঙ্গাবক্ষে সন্তরণ প্রতিযোগিতাও হত।

এই সূত্রে তরবারিতে মার্তাজা সাহেবের পদ্ধতি, বড় লাঠিতে অতুল

ঘোষ (উলুবেড়িয়ার বিখ্যাত লাঠিয়াল), ছোটলাঠি, ছোরা, তলোয়ারে যাদুগোপাল, মুষ্টিযুদ্ধে (**Boxing**) নগেন দত্ত, সুরদাস প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। জাপানী ওস্তাদ "গিঝিন" জাপানী তলোয়ার খেলা শিক্ষা দিতেন। জাপান প্রত্যাগত রমাকান্ত রায় ও বিখ্যাত জাপানী লেখক কাকুজো ওকাকুরা (**Kakuzo Okakura**) এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দিতেন।



সতীশ চন্দ্র বসু

কলকাতায়, তথা অধুনা পশ্চিমবঙ্গে, অনুশীলন সমিতি সুপ্রতিষ্ঠিত হলে পূর্ববঙ্গে সমিতির প্রসার বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পি. মিত্র মহাশয় স্বয়ং ঢাকায় গমন করেন এবং সেখানে একটি মুখ্য কেন্দ্র স্থাপন করেন। পুলিনবিহারী দাসের অসাধারণ কর্মপ্রচেষ্টা ও সংগঠন শক্তির পরিচয় পেয়ে তাঁহার উপরেই ঐ কেন্দ্রের সমস্ত ভার ন্যস্ত করেন। পরে পুলিনবাবু লাঠিখেলা ও অসি শিক্ষায় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ক্রমে ক্রমে সমস্ত পূর্ববঙ্গেই অনুশীলন সমিতির প্রভাব বিস্তার হল এবং সকলেই পুলিনবাবুর নেতৃত্ব স্বীকার করে নিয়ে তাঁরই পরিচালনায় নানারূপ বৈপ্লবিক কার্য সম্পাদন করতে লাগলেন। এইভাবে ক্রমে ক্রমে পাটনা, কাশী, দিল্লী, গৌহাটী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশেও অনুশীলন সমিতির শাখা বিস্তার হতে শুরু হল।

শরীরিক উৎকর্ষ বিধানের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক উন্নতির জন্যেও নানারকম জ্ঞানবৃদ্ধির আয়োজন ছিল। দেশ বিদেশের উৎকৃষ্ট গ্রন্থাবলী পাঠ করতে সকলকেই উৎসাহিত করা হত—বিশেষ ভাবে বীরপুরুষদের জীবনচরিত, বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতার কাহিনী ইত্যাদি। যথা—মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত, টডের রাজস্থান, সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, রাশিয়ার নিহিলিষ্ট রহস্য ইত্যাদি পড়া হত।

ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস ও তাহার মূলমন্ত্র **Liberty, Equality and Fraternity** ও ইতালীর তিন মহাপুরুষের, মাৎসিনী গারিবাল্‌দী ও কাভুর-এর জীবনচরিত অবশ্য পাঠ্য ছিল। এসব ছাড়া অবশ্য পাঠ্য ছিল স্বামী বিবেকানন্দের সমগ্র রচনাবলী।

সমিতিতে নিয়মিত রাজনীতি, অর্থনীতি, দেশের কথা ও জন্মভূমির প্রকৃত পরিচয় প্রভৃতি আলোচনা হত। এসবের জন্যে সখারাম গণেশ দেউস্কর মশাই বিশেষ পরিশ্রম করেছিলেন। তখন তিনি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "দেশের কথা" প্রণয়ন করেন। শিক্ষা বিস্তার ও অধ্যয়নের জন্যে

কলকাতায় সমিতির সংলগ্ন একটি পাঠাগারও ছিল। তাতে অনুমান ৪০০০ উৎকৃষ্ট বই ছিল। কলকাতার দর্শনীয় স্থানগুলি দেখান হত যথা, স্বামী বিবেকানন্দ, ডব্লিউ সি. ব্যানার্জী, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষির আবাসস্থান, মধুসূদনের স্মৃতিসৌধ ইত্যাদি। বলা বাহুল্য বিশেষজ্ঞদিগের দ্বারা এইসব ভ্রমণ পরিচালিত হত। **Sociology, History, Politics, History of Bengali Literature, Political Science, Moral Philosophy** প্রভৃতি বিশেষ ক্লাস করে পড়ান হত।

আগেই বলেছি স্বামী বিবেকানন্দর রচনাবলী জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ প্রভৃতি এবং অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের ভক্তিযোগ ও সংযম শিক্ষা অবশ্যপাঠ্য ছিল। গীতা পাঠ করতে হত প্রত্যেক সভ্যকেই।

নৈতিক উন্নতির জন্য সপ্তাহে একদিন (রবিবার বৈকাল) মরাল ক্লাস হত। সেখানে রামায়ণ, মহাভারত, কথকতা, গীতা, চণ্ডী পাঠ ও ব্যাখ্যা করা হত। হরিদাস হালদারের রাবণ-বধ পালা কথকতার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশ বন্দনা ও ধর্মসংগীত গাওয়া হত। এই মরাল ক্লাস প্রধানতঃ সতীশচন্দ্র বসুর বিশিষ্ট সহকর্মী যতীন্দ্রনাথ শেঠ কর্তৃক নিয়মিতভাবে এবং অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পরিচালিত হত। প্রধানতঃ অমৃতলাল গুপ্ত মশায় গান ধরতেন, আর সকলে একসঙ্গে সুর মিলিয়ে গান করতেন। সে কি উন্মাদনা! সে কি উদ্দীপনা! এইখানে উল্লেখযোগ্য যে অনুশীলন সমিতির সভ্যরাই প্রকৃত বীরোচিত সুরধ্বনির জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দে মাতরম্' গান করতেন। এটা ছিল সকল প্রেরণার উৎস।

আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যে নানাবিধ উপদেশ ও সাধন পদ্ধতির ব্যাখ্যা প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল। সংযমশিক্ষা ও ব্রহ্মচর্য পালনের উপায় ও নির্দেশ দেওয়া হত। সেজন্যে সত্যচরণ শাস্ত্রী, শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রভৃতি নিয়মিত আসতেন ও অনুরাগী

সভ্যদের যথাসাধ্য সাহায্য করতেন। বেদ উপনিষদে অমৃতের সন্ধান, মরণের ভয় জয় করে মৃত্যুঞ্জয়ী হবার পন্থা, আত্মজ্ঞান ও মানব জীবনের রহস্য প্রভৃতি সনাতন তত্ত্ব সরল সহজ উপায়ে মনের মধ্যে গেঁথে দেওয়া হত। এইভাবে যুবকদের চরিত্র গঠনের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হত।

ভারতের ইতিহাসের একটি বৈশিষ্ট্য—রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। পৌরাণিক যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত এই বৈশিষ্ট্যই লক্ষিত হবে। রাজর্ষি জনকের সঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্য মুনির, ছত্রপতি শিবাজীর সঙ্গে গুরু রামদাস, বিবেকানন্দের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের, মাত্র এই কয়েকটি সম্বন্ধের উল্লেখ করলেই চলবে। এই জন্যেই শক্তি অর্চনার সঙ্গে সঙ্গেই অনুশীলন সমিতিতে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বল অর্জনের জন্যে বিশেষ মনযোগ দেওয়া হত।

উদ্দীপনার উৎস স্বরূপ নানারকম জাতীয় সঙ্গীত সকল সভ্য একসঙ্গে মিলে গাইতেন। বিশেষতঃ কবি ডি. এল. রায়ের বীরত্বব্যঞ্জক কবিতাগুলি সামরিক কায়দায় কোরাস্ সহকারে গীত হত—

“যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ
সেদিন বিশ্বে সে কি কলরব সে কি মা ভক্তি সে কি মা হর্ষ।”

অথবা

“বঙ্গ আমার! জননী আমার! ধাত্রি আমার! আমার দেশ!
কেন গো মা তোর ধূলায় আসন, কেন গো মা তোর মলিন বেশ!
যদিও মা তোর দিব্য আলোকে ঘেরে আছে আজ আঁধার ঘোর
কেটে যাবে মেঘ নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর;
আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা, মানুষ আমরা নহি তো মেঘ।*
দেবি আমার! সাধনা আমার! স্বর্গ আমার! আমার দেশ!”

---

* কবি প্রথমে লিখেছিলেন: “হৃদয়রক্ত করিয়া শেষ”। পরে বন্ধুদের পরামর্শে বদল করেন।

অবশ্য চিত্তবিনোদনের জন্য অবসর মত মধ্যে মধ্যে পদব্রজে, নৌকা-যোগে, রেলপথে সভ্যদের বেলুরমঠ, দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির, শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন, শ্রীরামপুর প্রভৃতি নানা স্থানে নানা উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হত। অনেক সময় বনভোজনের আয়োজন করা হত। মধ্যে মধ্যে কলকাতার উপকণ্ঠে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হত।

সমিতির সভ্যদের কিরকম কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হত তা এই বললেই যথেষ্ট হবে যে, প্রত্যহ নিয়মিত ব্যায়াম করতে হত, মরাল ক্লাস প্রভৃতি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হত, সকল বিষয়ে স্বাবলম্বী হতে হত—খেলার মাঠ ঝাড়ু দেওয়া, পাঠাগারের বই রৌদ্রে দেওয়া ও ঝাড়া, আলমারি সাফ করা, অফিস ঘরে কলি দেওয়া, এমন কি ড্রেন সাফ করা, জঞ্জাল ফেলা, নৌকায় দাঁড় টানা, হালধরা, দীর্ঘ পথভ্রমণ, সাই-কেল চালানো ইত্যাদি।

কিম্বদন্তি আছে যে প্রাচীনকালে গ্রীসদেশে স্পার্টান জাতির ছেলেদের শক্তি পরীক্ষার জন্যে পাহাড়ের উপর হতে নীচে ছুঁড়ে ফেলা হত। সমিতির সভ্যদেরও সেইরূপ কঠোর পরীক্ষা দিতে হত। কেউ কি কল্পনা করতে পারেন যে. গলায় ফাঁসি দিলে যাতে শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যু না ঘটে—পরন্তু ফাঁসির দড়ি ছিঁড়ে যায়—তার জন্যে কোন সভ্য নিয়মিত চর্চার দ্বারা গ্রীবাদেশ শক্ত করেছিলেন। তিনি চিৎ হয়ে শুয়ে গলায় বাঁশ দিয়ে দুধারে দুজনকে বসতে বলতেন। এইভাবে প্রত্যহ অভ্যাস করাতে তাঁর গ্রীবা লৌহবৎ কঠিন হয়েছিল। তাঁর নাম পুলিনবিহারী মুখোপাধ্যায়। সেই বাঁশের একদিকে বসবার পরম সৌভাগ্য লেখকের হয়েছিল।

এইভাবে সমস্ত সভ্যের সমবায়ে যেন একটি যৌথ পরিবার গড়ে উঠল। নেতৃবৃন্দ সবদিকেই লক্ষ্য রাখতেন—কে কেমন ব্যায়ামচর্চা করছে, কে কতদূর লাঠিখেলা শিখল, কার ওজন কতটা বাড়ল, স্কুল কলেজে কেমন লেখাপড়া হয়, কে পুষ্টিকর খাদ্য পায় এবং কে পায়

না—এসব তদারক করতেন। আবার কোন সভ্যের অসুখ হলে তার বাড়িতে খোঁজ নিতেন ও সেবার জন্যে লোক পাঠাতেন।

সমিতির সভ্যদের মধ্যে যে যেরকম কাজের উপযুক্ত তাকে সেই কাজের ভার দেওয়া হত। সাধারণ সভ্যদের মধ্য হতে পরীক্ষা করে বিশেষ বিশেষ কর্মী সংগ্রহ করা হত। গুপ্তকাজের জন্যে কালী মন্দিরে দীক্ষা দেওয়া হত। দেবী সমক্ষে স্বীয় অঙ্গুলির রক্ত দ্বারা প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষরিত হত। কোন মন্ত্রণা বা তথ্য প্রকাশ করবে না, কোন প্রতারণা করবে না, সমিতির বিরুদ্ধাচারণ করবে না, বা রাজশক্তির গুপ্তচরবৃত্তি করবে না, নিমক্‌হারামী করবে না। প্রাণ পর্যন্ত পণ করে উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়তা করবে। কাজ সফল করবার প্রয়াস পাবে। এমন মন্ত্রগুপ্তি শিক্ষা দেওয়া হত যে, একজন সভ্য কি করে না করে অন্য সদস্যদের কেউ জানতে পারত না—এমন কি কেউ কেউ নিজেই কি করছে তাও বিশেষভাবে বুঝত না। কোথাও চিঠি দিয়ে এল, তাতে কি নির্দেশ আছে জানা নেই। কোথাও জুতোর বাক্স দিয়ে আসতে হল তাতে কি আছে খুলে দেখবার হুকুম নেই—হয়ত পিস্তল থাকতে পারে নচেৎ এত ভারী কেন? এইরূপে বিপ্লব কাজের পরিচালনা হত। কোন কোন বিশিষ্ট নেতা সংগোপনে পিছনে থেকে এই সকল পরিচালনা করতেন। তাঁরাই ছিলেন Brain behind the organisation। সমিতির সভ্যদের বন্ধুত্ব সম্বন্ধে নিম্নলিখিত চাণক্য বাক্যটি সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য ছিল—

উৎসবে ব্যসনে চৈব, দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে
রাজদ্বারে শ্মশানে চ, যঃ তিষ্ঠতি সঃ বান্ধবঃ।

সম্পদে বিপদে সকল অবস্থায় সভ্যরা পরস্পরকে সাহায্য করেছে, তাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও আত্মীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। সখ্যতা কষ্টিপাথরে যাচাই হয়েছে। মহৎ উদ্দেশ্যে একত্রে কাজ না করলে সখ্যতা দৃঢ় হয় না। তাই সমিতির সভ্যদের মধ্যে যে প্রীতির নিবিড় বন্ধন গড়ে উঠেছিল অন্যত্র সেরূপ সম্ভবপর হয় নি।

কিন্তু অনুশীলন সমিতির সর্বতোমুখী শিক্ষা মাত্র এতেই পর্যবসিত ছিল না। ঠাকুর রামকৃষ্ণের নির্দেশ মত নরনারায়ণের সেবায় সমিতি আত্মনিয়োগ করেছিল। নিম্ন ও মধ্যবিত্ত দুঃস্থ পরিবারদের সাহায্য দেবার জন্যে দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা করা হত এবং সংগৃহীত চাল, ডাল অনাথ বালক বালিকা ও বিধবাদের মধ্যে বিতরণ করা হত। এই বিভাগটিই স্বতন্ত্রভাবে অধুনা লব্ধপ্রতিষ্ঠ 'দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার' নামে জনসাধারণের সেবায় নিয়োজিত।* বন্যা বা দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত স্থানে দলে দলে দায়িত্বশীল সভ্যদেরকে রিলিফ (ত্রাণকার্য্য) ও চিকিৎসার বন্দোবস্তের জন্য প্রেরণ করা হত। সমিতির নানাবিধ সমাজহিতৈষা ও জনসেবা কাজের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া সম্ভবপর নয়। উপরে কেবলমাত্র কতকগুলির ইঙ্গিত দেওয়া হল।

অনুশীলন সমিতিই বাংলাদেশে প্রথম স্বেচ্ছাসেবক প্রথা প্রচলন করে। সমিতির সভ্যরা বেলুড়মঠে রামকৃষ্ণ উৎসবে দর্শকবৃন্দের সেবা করত ও দরিদ্রনারায়ণ ভোজন পরিচালনা করত। পরলোকগত সারদাচরণ মিত্র মশায়ের উদ্যোগে টাউন হলে তিনদিন ব্যাপী এক সর্বধর্ম সম্মেলন হয়েছিল। তার আয়োজন ও তত্ত্বাবধানের কাজে অনুশীলন সমিতি প্রধান উদ্যোগী হয়। তার পর ১৯০৬ সালে বাংলা ও মহারাষ্ট্র দেশের মধ্যে প্রীতিবন্ধন দৃঢ় করবার জন্যে কলকাতায় 'শিবাজী উৎসব' অনুষ্ঠিত হয়।** তার সমস্ত পরিচালনা ভারত সমিতি গ্রহণ করে। এই সুযোগে বাল গঙ্গাধর তিলক, খাপার্দে, এম. এস. মুঞ্জে প্রভৃতি মহারাষ্ট্র নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। ১৯০৬ সালে গ্রীষ্মকালে শিবাজী উৎসব হয়। তদুপলক্ষে উপরোক্ত তিনজন মহামান্য

---

* এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের সুযোগ্য সম্পাদক চন্দ্রশেখর গুপ্ত সমিতির একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন এবং তিনি প্রশংসনীয় নিষ্ঠার সঙ্গে সেবাধর্ম প্রতিপালন করেছিলেন।

** পান্তির মাঠ, ১৭নং বিধান সরণী, কলকাতা। অধুনা সেখানে বিদ্যাসাগর কলেজ ছাত্রাবাস।

অতিথি কলকাতায় আসেন ও সমিতি পরিদর্শনে পরম প্রীত হন। ১৯০৬ সালে কলকাতায় দাদাভাই নৌরজীর নেতৃত্বে যে কংগ্রেস অধিবেশন হয় তাতেও অনুশীলন সমিতির স্বেচ্ছাসেবক দল সবিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। ১৯০৮ সালে অর্ধোদয় যোগ উপলক্ষে গঙ্গাস্নানের জন্য অসংখ্য লোক সমাগম হয়েছিল। তার নিয়ন্ত্রণ ও জনসেবার জন্যে সমিতির সভ্যরা স্বেচ্ছাসেবক কাজে ব্রতী নেতৃবৃন্দের প্রশংসা অর্জন করেছিল। এই সমস্ত কাজে পরলোকগত দেশসেবক নরেন্দ্রনাথ শেঠ মশাই বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

অনুশীলন সমিতিই সর্বপ্রথম কলকাতায় শ্রমজীবি বিদ্যালয় বা **Working Mens Institution** প্রবর্তন করেছিল। এই বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী ও কর্মী ছিলেন সোদপুর তেঘরা নিবাসী পরলোকগত শশীভূষণ রায়চৌধুরী। তাঁরই উদ্যোগে অনুন্নত শ্রেণীর নিরক্ষর জনগণের জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। রাত্রে ও ছুটির দিনে সভ্যরা দরিদ্র শ্রমিক সন্তানদের লেখাপড়া শেখাত। শিক্ষাব্রতী সুশীলকুমার আচার্য মশাই ছিলেন এর প্রধান উদ্যোক্তা। এটা আরম্ভ করেন শরৎচন্দ্র ঘোষ, যতীন শেঠ প্রভৃতি। এই নৈশ বিদ্যালয়ের শিক্ষা কেমন ফলবতী হয়েছিল তার একটিমাত্র উদাহরণ দিলেই চলবে। সিমলার জনৈক মুটিয়ার ছেলে যথাক্রমে ম্যাট্রিক, আই. এ. ও বি. এ পাশ করে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পর্যন্ত হয়েছিল। আরও আশ্চর্যের কথা এই, তখনও তার পিতা মুটিয়াগিরিই করত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলামী শিক্ষা পরিত্যাগ করে জাতিগঠন-মূলক শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠা এই সময়ের অপর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা একথা আগেই বলেছি। রাজা সুবোধ মল্লিক, স্যার রাসবিহারী ঘোষ, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, ডঃ বিনয়কুমার সরকার প্রভৃতি কয়েকজন প্রাতঃস্মরণীয় মনীষির সক্রিয় সাহায্য ও অর্থদানেই এই কাজ সম্ভবপর হয়েছিল।

এইখানে বিশেষভাবে নাম করা দরকার স্বনামধন্য অধ্যাপক মনীষি ডঃ বিনয়কুমার সরকার (১৮৮৭-১৯৪৯) এর।

ভারতের চিন্তাশীল মহলে এমনকি সাধারণ মানুষের কাছে বিনয় সরকারের পরিচয় অধ্যাপক এবং পণ্ডিত বলে। বিনয় সরকার দেশ-বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে ধনবিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞানের অধ্যাপনা করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধনবিজ্ঞানের অধ্যাপনা করেছেন ১৯২৬ থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত। ১৯৪৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতে করতেই ওয়াশিংটনে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন ১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসে।

বিনয় সরকারের জন্ম মালদহে ২৬ ডিসেম্বর ১৮৮৭ সালে। পৈত্রিক ভিটা ছিল ঢাকা জেলার সানিহাটি গ্রামে। ১৯০২ সালে এনট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলেন বিনয়। তারপর যথাক্রমে এফ এ এবং বি এ পরীক্ষাতেও প্রথম হন ১৯০৫ সালে। ১৯০৬ সালে ইংরেজীতে এম এ পাশ করেন প্রথম শ্রেণীতে। সারা জীবনে তিনি লিখেছিলেন ৮৮ খানা বই। তার মধ্যে ৪৪ খানা ইংরেজীতে, ৩৪ খানা বাংলায়, বাকিগুলো লেখেন ফরাসী, জার্মান ও ইতালিয়ান ভাষায়।

বিনয় সরকারের দ্বিতীয় পরিচয় হচ্ছে বিপ্লবী হিসেবে। তাঁর বিপ্লবী জীবন শুরু ১৯০৫ সালে মহান বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় থেকেই। এই সময়ে তিনি সতীশ মুখার্জী প্রতিষ্ঠিত ডন সোসাইটিতে যোগদান করেন।

ওটাও ছিল বিপ্লবীদেরই আখড়া। ১৯০৬ সালে বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হলে ওই সংস্থায় বিনয় প্রতিষ্ঠাতা কর্মী হিসেবে যোগদান করেন। সেই থেকেই অধ্যাপক হিসেবে তাঁর জীবন শুরু হয়। পরবর্তীকালে বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ স্থাপন করেছিল একটি কলেজ এবং যাদবপুরে আরেকটি কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং। যাদবপুরের এই কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিংটিই পরবর্তীকালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ নেয়।

১৯০৫ সালে যখন ঢাকায় অনুশীলন সমিতি স্থাপিত হল তখন থেকেই বিনয়ের আত্মিক যোগাযোগ ওই বিপ্লবীদলের সঙ্গে। পরে যখন বিনয় ইউরোপ-আমেরিকায় প্রবাসী অধ্যাপক হিসেবে ১৯১৪—১৯২৬ পর্যন্ত দেশে-দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তখন (১৯১৪—১৮ পর্যন্ত) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় বিপ্লবী দল গদরপার্টির সক্রিয় সদস্য হিসেবে কাজ করেন। গদরপার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক ডঃ তারকনাথ দাস ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। গদরপার্টি প্রেরিত অস্ত্রবোঝাই যে জাহাজটি ১৯১৫ সালে ভারতে এসেছিল ওটির প্রেরকদের মধ্যেও ছিলেন বিনয়। তারপর ১৯২০ থেকে ১৯২৫ পর্যন্ত বার্লিনে যে ভারতীয় বিপ্লবী কমিটি কাজ করে তারও অন্যতম সদস্য ছিলেন বিনয়। অন্য সদস্যদের মধ্যে একজন ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের ছোট ভাই ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।

১৯১০ সালে বিনয় একটি সংস্থা গড়ে তোলেন যার কাজ ছিল বিপ্লবীদের বিদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রেরণ করা। এই কাজ চলে ছিল ১৯৩০ সাল পর্যন্ত। বিনয় সরকার প্রেরিত বিপ্লবী ছাত্রদের অনেকের মধ্যে ছিলেন বাণেশ্বর দাস, হীরালাল রায়, হেম নাগ, সুরেন রায়, কিরণ রায়, ত্রিগুণা সেন এবং আরও বহু ব্যক্তি।

বিনয় সরকার কোনো দিন দুর্বল চিত্ত রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আপোষ করেন নি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন বিপ্লবী। ইউরোপ থেকে তিনি ভারতের বিপ্লবীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ

রাখতেন এবং বহু বই লিখেছেন তাঁদের জন্যে। সেই সব বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :—

বর্তমান জগৎ গ্রন্থাবলী (১৯১৪—১৯৩৫) তের খণ্ড। পরাজিত জার্মানী, প্যারিসে দশমাস, ইতালিতে বারকয়েক, সুইৎজারল্যাণ্ড ইত্যাদি। হিন্দুরাষ্ট্রের গড়ন (১৯২৬), পরিবার গোষ্ঠি ও রাষ্ট্র (১৯২৭), ধনদৌলতের রূপান্তর (১৯২৮), একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র (দুই খণ্ড ১৯৩০—৩৫), নয়া বাঙ্গলার গোড়া পত্তন (দুই খণ্ড ১৯৩২), বাড়তির পথে বাঙালী (১৯৩৪), বাংলায় ধনবিজ্ঞান (দুই খণ্ড ১৯৩৭—১৯৩৯), সমাজ বিজ্ঞান (১৯৩৮), Positive Background of the Hindu Sociology (১৯১৪—৩৭), The Chineese religion through Hindu eyes (১৯১৭), The Political Institutions and theories of the Hindus (১৯২২), Political Philosophies since 1905 (১৯২৮—১৯৪২, চার খণ্ড), Creative India (১৯৩৭), The villegrs and Towns as Social Patterns (১৯৪১), Dominion India in World Perspectives (১৯৪৯)।



প্রমথনাথ মিত্র

নব প্রতিষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষা পরিষদে অরবিন্দপ্রকাশ ঘোষ প্রমুখ অনেক সুবিখ্যাত শিক্ষাব্রতী সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অনুশীলন সমিতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যুক্ত এই শিক্ষায়তনই পরবর্তীকালে **College of Engineering and Technology, Jadavpur,** নামে খ্যাতি অর্জন করে। এই প্রতিষ্ঠানটিই অধুনা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। একথা আগেই বলেছি।

অনুশীলন সমিতির পরিচালকেরা সব ক্ষেত্রেই নূতনত্বের পথ-প্রদর্শক ছিলেন। তাঁদের সৃজনীশক্তির একটি উদাহরণ দিলেই চলবে। সাধারণ দুর্গোৎসব অনুষ্ঠান পালন করা হত অথচ কোন প্রতিমা ছিল না। শক্তি আরাধনায় কেবলমাত্র অস্ত্রশস্ত্র ছিল সম্বল। লাঠি, বর্শা, সড়কি, তরওয়াল, ছোরা, ভোজালি, খাঁড়া এই সব সজ্জিত করে এক অপরূপ প্রতীক নির্মিত হত এবং এই বহুবলধারিণী দেবীর উপাসনা করা হত। মহারাষ্ট্র হতে ব্রাহ্মণ আমন্ত্রিত করা হত এবং বৈদিকমন্ত্রে নূতন ধরণের পূজা হত। একথাও উল্লেখযোগ্য যে অনুশীলন সমিতিই কলকাতায় সর্বপ্রথম সার্বজনীন দুর্গাপূজা প্রবর্তন করে।* এই সূত্রে অনুশীলন সমিতির কয়েকজন প্রধান পরিচালকদের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা হলেন সত্যবিনয় মল্লিক, যতীন্দ্রনাথ শেঠ, ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র ঘোষ, প্রিয়ব্রত সরকার, পুলিনবিহারী মুখার্জী, শৈলেন্দ্রনাথ দত্ত, কালীচরণ সেন, কামাখ্যানাথ সেনগুপ্ত, রাধানাথ দে, নেপালচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি।

এবার বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর পরিচয় কিছুটা দেওয়া প্রয়োজন। প্রথম জীবনে যুগান্তর দলের কর্মী হিসেবে পরিচিত

---

* জনসাধারণের মধ্যে সার্বজনীন দুর্গাপূজা প্রচলন করেন সিমলা ব্যায়াম সমিতির প্রতিষ্ঠাতা অতীন্দ্রনাথ বসু মশাই ১৯২৬ সালে। তিনি বড় লাঠি খেলায় অসাধারণ নৈপুণ্য দেখাতেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র অমর বসু প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতা। এঁরা উভয়েই অনুশীলন সমিতির সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

হলেও যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ই তাঁকে সক্রিয়ভাবে সমিতির কাজে নিয়ে আসেন। সেদিক দিয়ে তাঁকে যতীন্দ্রনাথেরই আর এক আবিষ্কার বলা যায়। দেশের জন্য তাঁর ত্যাগ, দেশবাসীর জন্য মমতা, অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত তাঁর বিপ্লবী চেতনা ও সর্বোপরি অসাধারণ সংগঠনী প্রতিভা ও শক্তি উপন্যাসের নায়কের মতই চমকপ্রদ।

রাসবিহারী বসুর জন্মস্থান বর্ধমান জেলার সুবলদহ গ্রামে। শিক্ষা সুবলদহের স্কুলে ও চন্দননগরের ডুপ্লে কলেজে। প্রথমদিকে সিমলায় সরকারী প্রেসে কিছুদিন কাজ করেন। তারপর ভাল না লাগায় ছেড়ে দিয়ে চন্দননগরে ফিরে আসেন। এই সময়ে যুগান্তর বিপ্লবী দলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। এরপর রাসবিহারী কসৌলীতে চলে গিয়ে পাস্তুর ইনস্টিটিউটে কিছুদিন ও তারপর দেরাদুনে বন গবেষণা বিভাগে চাকুরী নেন। এই সময়েই যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে খুঁজে বার করেন। রাসবিহারীর উদ্যোগে ২৩শে ডিসেম্বর ১৯১২ খৃঃ দিল্লীতে ভাইসরয় হার্ডিঞ্জের শোভাযাত্রায় বোমা ছোঁড়া হয়। রাসবিহারীর বয়স তখন ২৬ বৎসর। তিনি আত্মগোপন করেন। এরপরে ১৯১৪ খৃঃ লাহোর ষড়যন্ত্রের মামলায় তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়। তিনি আবার পালান। এই সময়েই রাসবিহারী, গদরদল, পিংলে, যুগান্তর দল, বাঘা যতীন (মুখোপাধ্যায়) ও শচীন সান্যাল-এর সম্মিলিত সহযোগীতায় পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ ও বাংলাদেশে জার্মান অস্ত্র সাহায্য নিয়ে বিপ্লবী ও সৈন্যদলের এক যুগপৎ অভ্যুৎথানের পরিকল্পনা করেন। পিংলে ধরা পড়ে যাওয়ায় এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়। রাসবিহারীকে আবার পালাতে হয়। এবার তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন এবং কলকাতার খিদিরপুর ডক থেকে সানুকী মারু নামে একটি জাপানী জাহাজে চড়ে ১১ই মে (১৯১৫ খৃঃ) জাপানে পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করে থাকেন কারণ তদানীন্তন জাপান সরকার বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের মিত্রদেশ ছিল। কিছুদিন বাদে শোমা নামে এক জাপানী মহিলার পাণিগ্রহণ করে জাপানী নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন ও জাপানী জাতি ও সরকারের সহযোগিতায়

মুক্ত ভাবে নতুন উদ্যমে কাজ সুরু করে দেন। ১৯২৪ খৃঃ তিনি বিদেশের মাটিতেই Indian Independance League প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান যোগ দিলে দূর প্রাচের সমস্ত দেশ পরিভ্রমণ করে ক্যাপটেন মোহন সিং ও সর্দার প্রীতম সিং এর সহায়তায় ঐতিহাসিক Indian National Army গঠন করেন। রাসবিহারী মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন এবং প্রচার করতেন Enemy of your Enemy is your friend." তিনি যুদ্ধ চলাকালীন রেডিও মারফৎ ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে বহু বক্তৃতা প্রচার করেছেন। পরে ১৯৪৩ খৃঃ নেতাজী সুভাষচন্দ্র জাপানে গিয়ে পৌছুলে রাসবিহারী সুভাষচন্দ্রের হাতে INAএর কর্তৃত্বভার অর্পণ করেন।

এতো গেল মোটামুটিভাবে পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গের (কলকাতা কেন্দ্রিক) সংগঠন কেন্দ্রগুলির কথা। উত্তর ও পূর্ববঙ্গের যে সংগঠন-গুলি ছিল তার মধ্যে প্রধান ছিল ঢাকার কেন্দ্রীয় সমিতি। লাঠি সেনাপতি পুলিনবিহারী দাসের নেতৃত্বে এর পরিচালনা হত। ঢাকা অনুশীলন সমিতির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছিলেন পি মিত্র মশাই ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে। বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পালও এ উপলক্ষে ঢাকায় উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা অনুশীলন সমিতির স্থান কলকাতা কেন্দ্রের পরেই ছিল। এ ছাড়া মালদহ, মৈমন সিংহ, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলের কেন্দ্র-গুলিও অত্যন্ত সুপরিচালিত ও শক্ত ঘাঁটি হিসেবেই পরিচিত ছিল।

পুলিন দাসের সাংগঠনিক সাহচর্যে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে উজ্জ্বলতম মানুষ ছিলেন বিপ্লবী বিনোদ বিহারী চক্রবর্তী। এঁর কথা পরে যথাস্থানে বলা যাবে।

এইভাবে অনুশীলন সমিতি বাংলার নবীন যুবক সম্প্রদায়কে নানারকম দায়িত্বপূর্ণ কাজে দক্ষতা অর্জনের সুযোগ দিয়েছিল। সভ্যেরা নানা কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল। কিন্তু দলের এক বিশিষ্ট অংশ এই সমস্ত সাধারণ কাজে সন্তুষ্ট রইলেন না। বাংলায় বিপ্লববাদের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অনুশীলন সমিতির কেন্দ্রগুলি Recruiting Centre-এ

পরিণত হল ; এর ফলে বিবিধ প্রতিষ্ঠানের বহু মৃত্যুঞ্জয়ী বীরসভ্য বাংলার বিপ্লবে যোগদান করেছিলেন। মাণিকতলা মুরারিপুকুর 'বোমার আড্ডা' থেকে আরম্ভ করে রডা কোম্পানীর পিস্তল সংগ্রহ (আত্মোন্নতি দ্বারা), তথাকথিত রাজনৈতিক ডাকাতি, রাজকর্মচারী হত্যা, প্রভৃতির দ্বারা বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিপ্লবী উদ্যোগ চলতে লাগল। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের বিপ্লবী ও সেনাদলের সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপিত হতে লাগল। অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ও আমদানির উদ্যোগ করা হল। ১৯১৪-১৬ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে মাতৃভূমিকে স্বাধীন করবার জন্য জাপান জার্মানী প্রভৃতি বিদেশের সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপিত হল এবং এই সমস্ত কঠিন এবং বিপজ্জনক কাজ অনুশীলন সমিতির প্রধান সভ্যেরা কৃতিত্বের সঙ্গেই সম্পাদন করলেন। এই কাজে ডাক্তার যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, রাসবিহারী বসু, ডঃ তারকনাথ দাস, যতীন্দ্রলোচন মিত্র, অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, বিনয়ভূষণ দত্ত, ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অগ্রণী ছিলেন।

এই বিপ্লবের সংগঠন, ক্রমবিকাশ, ষড়যন্ত্র, আয়োজন, কর্মপ্রণালী ও পরিণাম প্রভৃতি সমস্তই এক সুবিশাল ইতিহাস। এরই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে রাসবিহারী বসু জাপানে যান, ডঃ তারকনাথ দাস আমেরিকাতে যান, ভূপতি মজুমদার সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলেন।

ডক্টর তারকনাথ দাসের পরিচয় দেওয়া এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। রাসবিহারী বসুর মত তারকনাথও দেশে ফিরে আসার অদম্য ইচ্ছা সত্ত্বেও চিরকালের জন্যে প্রবাসী জীবন যাপন করতে বাধ্য হন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে গেরুয়া ধারণ করে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন তারকনাথ দাস। বিপ্লবী দলের সঙ্গে যোগাযোগও ঘটে তাঁর সেই ১৯০৫ সালেই।

সমিতির নেতাদের নির্দেশে ১৯০৭ সালে প্রথমে জাপানে ও পরে সেখান থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যেতে হয় তারকনাথকে। অনুশীলন সমিতির একজন সক্রিয় ও প্রথম সারির সদস্য হিসেবে অন্য কয়েকজন নেতার সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী কিছু ভারতীয় নাগরিকদের নিয়ে লালা লাজপত রায়ের আদর্শে বিপ্লবী দলের কাজকর্ম শুরু করেন। পরে এই সংগঠনটিই "গদর পার্টি" নামে পরিচিত হয়। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের সময়ে (১৯১৪-১৯১৭) আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাতে লালা হরদয়াল যে সমস্ত পরিকল্পনা রূপায়িত করতে সচেষ্ট হন তার সম্পূর্ণ সহযোগী হিসেবে পাশে ছিলেন ডক্টর তারকনাথ দাস।

১৯১৪ থেকে ১৯২৫ সালের মধ্যে আয়ারল্যাণ্ডের বিপ্লবী নেতা সাইমন ডি ভ্যালেরা যখন আমেরিকায় অবস্থান করছিলেন তখন পরিকল্পনা তারকনাথের সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটে। এর ফলে নূতন গ্রহণ করে তারকনাথ কয়েক বৎসরের জন্যে জার্মান, ইতালি ও তুর্কিদেশে কাটান। সেখানেও তিনি ভারতীয় বিপ্লবীদের সংগঠিত করার কাজ শুরু করেন। সে সময়টা ছিল ১৯২০ থেকে ১৯২৭ সালের ভেতর। ঐ সময়ে তিনি অনেক ভারতীয় বিপ্লবী ছাত্রকে প্রভূত সাহায্য করেছেন সর্বপ্রকারে। এর পরবর্তীকালে তারক দাস আমেরিকায় ফিরে গিয়ে নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের সিটি কলেজে

ইতিহাসের অধ্যাপক রূপে যোগদান করেন ও বাকী জীবন আমেরিকাতেই কাটাতে বাধ্য হন।

ডঃ তারকনাথ দাসের লেখা গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— ইণ্ডিয়া ইন ওয়ার্লড্ পলিটিক্স্ (১৯২৩), সভরেন রাইট্স্ অব ইণ্ডিয়ান প্রিন্সেস্ (১৯২৫), বৃটিশ একস্প্যান্শান্ ইন টিবেট (১৯২৭), ফরেন পলিসি ইন দি ফার ইস্ট্ (১৯৩৬) ইত্যাদি।

স্বাধীনতার পরে ১৯৫২ সালের মাঝামাঝি তারকনাথ একবার ভারতে এসেছিলেন কিছুদিনের জন্যে। সেটা তাঁর প্রবাস জীবন শুরুর সাতচল্লিশ বছর পরের ঘটনা। এখানে তখন তাঁর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কেউই জীবিত ছিলেন না। কোন পরিচিত পরিমণ্ডল খুঁজে না পেয়ে অবশেষে তিনি আবার আমেরিকাতেই ফিরে যান।

পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে নিউইয়র্ক শহরেই পরলোক গমন করেন ডক্টর তারকনাথ দাস।

ভারতীয় বিপ্লবের আর এক গুরুতর অধ্যায় ছিল গদর পার্টির উদ্যোগে কানাডায় শিখদের বিদ্রোহ প্রচেষ্টা। সুবিদিত গদর পার্টির প্রতিষ্ঠা, কোমাগাটামারু জাহাজের ভারতে আগমন, বজবজে অবতরণ এবং ইংরেজদের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ—এই সব ঘটনা আজ কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। গদর পার্টির প্রধান উদ্যোক্তা লালা হরদয়াল-এর সঙ্গে সমিতির হিতৈষী স্বামী নিরালম্বের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। এই সম্পর্ক সর্দার অজিত সিং ও কিষণ সিং এর মারফৎ লালা হরদয়ালের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

আগেই বলেছি এই উদ্দেশ্যে তারকনাথ দাস ও আরও কয়েকজন সভ্য বিদেশে চলে যান। কয়েকজন সভ্য শ্যাম, ব্রহ্মদেশ, মালয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশেও গিয়ে অস্ত্রশস্ত্র, রসদ ও সাহায্য সংগ্রহের চেষ্টা করতে লাগলেন। এমন কি চীনেও ডাঃ সান্ ইয়াৎ সেনের পরামর্শ নেওয়া হল। ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় ও বিনয়ভূষণ দত্ত জাভায় জার্মান কনসালের সঙ্গে বৈপ্লবিক সম্পর্ক বজায় রাখতে গোয়াতে গিয়ে ধরা

পড়ে পুলিশ নির্যাতনে প্রাণ হারালেন। অপর দিকে গভীর সুন্দরবনে ডাঃ যতীন্দ্র ঘোষাল, অশ্বিনীকুমার রায়, হরিকুমার চক্রবর্তী প্রভৃতি আর একদল গাছের উপর মাচা তৈরী করে দুরবীণ দিয়ে লক্ষ্য করতে লাগলেন—অস্ত্রের জাহাজ কখন আসে। মাল নামাতে হবে সকলের এক চিন্তা। এই সকল কাজে হিন্দু জমিদার ও মুসলমান মাঝি মাল্লাদের যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল।

এই সমস্ত বৈদেশিক কাজে যাঁরা অগ্রণী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে একজনের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি অনুশীলন সমিতির অন্যতম সভ্য নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। এই নরেন্দ্রনাথ ভারতের বাহিরে রুশবিপ্লবে ও নবীন রুশ তন্ত্রে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি পরে কমরেড এম. এন. রায় (মানবেন্দ্রনাথ রায়) নামে বিশ্ববিখ্যাত হন এবং বলশেভিজম্ ও কমিউনিজম্ সংগঠনে প্রভূত দক্ষতা প্রকাশ করেছিলেন।* সেই সময়ে ভারতের বাইরে আরও অনেকেই খ্যাতি লাভ করেন। আগেই উল্লেখ করেছি তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন—জাপানে রাসবিহারী বসু, আমেরিকায় তারকনাথ দাস ও ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় (ইনি ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের ছোট ভাই)। সিঙ্গাপুরে ভূপতি মজুমদার, ফণী চক্রবর্তী প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই নবজাগরণের সুযোগে অনেক বাঙালী যুবক বিদেশে উচ্চ শিক্ষালাভ করার পর দেশে ফিরে এসে নানাবিধ শিল্প প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করেছিলেন।

* M. N. Roy went to Moscow as a delegate to the Second World Congress of the Commintern. In the Commintern his career was rather meteoric. In 1922 he was a candidate member of its Executive Committee. Two years later he became its full voting member and joined the Presidium of the Commintern.

বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা ডাক্তার যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় কলকাতায় অনুশীলন সমিতির অন্যতম বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন একথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি এক সময়ে বাংলা তথা সমগ্র ভারতের বিপ্লবই পরিচালনা করেছিলেন। বিপ্লবের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রকাশ পাওয়ায় কয়েক বৎসর তিনি নিরুদ্দেশ থাকতে বাধ্য হন। তাঁকে গ্রেপ্তার করবার জন্য ২০,০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষিত হল। এই অজ্ঞাতবাসকালে তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন ছদ্মবেশে, বিভিন্ন অবস্থায় ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর সম্পূর্ণ জীবনী প্রকাশিত হলে জনসাধারণ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হবেন। শোনা যায় যাদুগোপালের অপূর্ব জীবনকাহিনীর কিছুমাত্র আভাষ নিয়েই অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর "পথের দাবী" লিখেছিলেন। তার প্রধান চরিত্র সব্যসাচীই যাদুগোপালের প্রতীক। তাঁর সুযোগ্য ভ্রাতা ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় অগ্রজকে উপলক্ষ্য করে My Brother's Face নামক পুস্তকটিতে আমেরিকা ও পাশ্চাত্য জগতে অগ্রজের এই অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় প্রকাশ করেন।

বিদেশী শাসকদের হাতে অশেষ নির্যাতন ভোগ করে ডাঃ যাদুগোপাল পরবর্তীকালে রাঁচিতে বসবাস করতে বাধ্য হন কারণ বাংলায় তাঁর প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। সেখানে তিনি চিকিৎসায় ব্রতী হন। ১৯৫৮ সালে তিনি "বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি" নামে একখানি বিশদ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাতে বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টার ধারাবাহিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। এতে ভবিষ্যতে বিপ্লবের ইতিহাস লিখবার অনেক উপকরণের সন্ধান মিলবে।*

এই সূত্রে আরও দুএকজনের নাম উল্লেখযোগ্য—একজন হলেন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসু। তিনি বাল্যকালেও যেমন

* বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি—যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ৯৩, হ্যারিসেন রোড, কলিকাতা ৭ সন ১৩৬৩।

সরল স্বভাব, অমায়িক ও বন্ধুবৎসল ছিলেন পরেও তাই। আর একজন হচ্ছেন বঙ্গবাসী কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক লাড্‌লীমোহন মিত্র। ছাত্রমহলে তাঁর সুনাম ও প্রতিপত্তি অবিসম্বাদী ছিল। ডঃ রসিকলাল দত্ত ডি. এস-সি. ছিলেন Industrial Chemist to the Govt. of Bengal. ইনি সংগোপনে বোমা তৈরীর উপকরণ ও প্রস্তুত-প্রণালীর পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে পরামর্শ দিতেন। অন্যান্যদের মধ্যে যাঁরা অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুরেশ দাস (পরে কংগ্রেস নেতা), নলিনীকান্ত কর এবং বাঘাযতীন ছিলেন যাদুগোপালবাবুর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী। এইভাবে এক সময় সমস্ত বঙ্গদেশে অনুশীলন সমিতির অপরিসীম প্রভাব অনুভূত হয়েছিল। বস্তুতঃ তদানীন্তন সরকারী রিপোর্টে স্বীকৃত হয়েছিল যে মুষ্টিমেয় বাঙালী যুবক শুধু কয়েকটি বোমা ও পিস্তল নিয়ে নয়, পরন্তু ব্যাপকভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে, বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা প্রায় অচল করে দিয়েছিল। ১৯১৫ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে একই দিনে পেশোয়ার থেকে ব্যারাকপুর পর্যন্ত সশস্ত্র সিপাহী বিদ্রোহের ব্যবস্থাও হয়েছিল। কিন্তু জনৈক সিপাহীর বিশ্বাসঘাতকতায় তা বিফল হয়ে যায়।

অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র বসু

সতীশচন্দ্র ১২৮৩ সালে, ইং ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে, কলকাতায় এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক বাসস্থান ছিল কলকাতা ৯১নং বেচু চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, ঠনঠনিয়া কালীতলার পূর্বদিকে। তাঁর পিতা ৺উমেশচন্দ্র বসু মশাই একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল ও কমিসরিয়েট অফিসে কাজ করতেন। তিনি অতি অমায়িক ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। বাল্যকাল হতেই নানাবিধ ব্যায়াম ও ক্রীড়ায় সতীশচন্দ্রের বিশেষ অনুরাগ লক্ষিত হত। সব বিষয়েই তিনি উৎসাহী ও উদ্যোগী ছিলেন। তাঁর পিতা তাঁকে সর্বদাই নির্ভীক, সাহসী ও স্বাবলম্বী হতে শিক্ষা দিতেন। এটাই তাঁর পরবর্তী জীবনে ও কর্মক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়েছিল।

সমিতি বে-আইনী ঘোষিত হবার পরও গুপ্ত কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে সংযুক্ত থাকার দরুণ একসময়ে সতীশচন্দ্রকেও নির্যাতন ভোগ করতে হয়। এবং সেজন্যে তাঁর পিতার পেন্সন বন্ধ হয়। এই বিচ্ছিন্ন অবস্থায়ও সতীশচন্দ্র সকলের খোঁজ খবর রাখতেন। সকলকে সব কাজেই উৎসাহ দিতেন। কঠিন দুরূহ কাজে সমীচীন পরামর্শ দিতেন, কেউ বিপদে পড়লে অকাতরে সাহায্য করতেন। সকলেরই মঙ্গল কামনা করতেন। শারীরিক দুর্বলতা, মানসিক অবসাদ বা আর্থিক দুরবস্থাই হউক—সকল সময়েই তাঁর নিকট সান্ত্বনা পাওয়া যেত। তিনি যেন সকলেরই অতি নিকট আত্মীয় ছিলেন।

ধর্মজীবনে সতীশচন্দ্র নিষ্ঠাবান ছিলেন। তিনি সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা করতে অত্যন্ত ভালবাসতেন। ভগবান তিব্বতীবাবা ও ব্রহ্মবিদ নিরালম্ব স্বামীর (বাংলায় বিপ্লববাদের অগ্রদূত—যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়) অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। নিয়মিতরূপে তাঁদের আশ্রমে

যেতেন ও সেবা করতেন। হাওড়ায় তিব্বতী বাবার বেদান্ত আশ্রম প্রতিষ্ঠায় তিনি ডাক্তার কুঞ্জেশ্বর মিশ্রের সঙ্গে অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন। প্রতি বৎসর তিনি আশ্রমের উৎসব আদিতে যোগ দিতেন এবং সভা ও ভাণ্ডারা প্রভৃতি পরিচালনা করে দর্শক ও অতিথিদের আপ্যায়িত করতেন।

সতীশচন্দ্র সরল, অমায়িক ও অনাড়ম্বর ছিলেন। তাঁর স্বভাব মধুর ছিলই। সকলের প্রতি প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করতেন। সকলকেই হাসিমুখে অভ্যর্থনা করতেন। আজীবন তাঁর স্বাস্থ্য ভাল ছিল। তাঁকে সুস্থ শরীরেই বিচরণ করতে দেখা যেত। কিন্তু অকস্মাৎ একদিন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হল। বাং ২৩শে আশ্বিন ১৩৫৫, ইং ৯ই অক্টোবর ১৯৪৮, স্বীয় অনুষ্ঠিত যজ্ঞের সফল পরিসমাপ্তির তৃপ্তি নিয়ে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁর একমাত্র পুত্র শ্রীমান ভূপাল বসু।

সতীশচন্দ্র আমাদের সকলের এত প্রিয় ছিলেন ও এত অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন যে তিনি আর আমাদের মধ্যে বর্তমান নেই একথা বিশ্বাস করতে মন চায় না। —সত্যিই “কীর্তির্যস্য সঃ জীবতি”। তিনি অনুশীলন সমিতিরূপ যে কীর্তি রেখে গিয়েছেন তা অক্ষয় অমর। বাঙ্গালীজাতি যতদিন বিদ্যমান থাকবে ততদিন তাঁর জন্য গৌরববোধ করবে।

স্মরণ-সভা

অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র বসুর স্মৃতি-সভার বিবরণ আনন্দবাজার পত্রিকা ৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৫৫ (ইং ২১-১১-৪৮) থেকে সংকলিত।

—“অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র বসুর মৃত্যুতে তাঁহার স্মৃতির সম্মান প্রদর্শনের জন্য ১০শে নভেম্বর ১৯৪৮ স্কটিশ চার্চ কলেজে অনুষ্ঠিত এক স্মৃতি-সভায় বিভিন্ন বক্তা বলেন যে, অনুশীলন

সমিতি সেকালে দেশে যুগান্তর আনিয়াছিল এবং জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই সৃজনীশক্তির পরিচয় দিয়াছিল। সমিতির প্রাণস্বরূপ সতীশচন্দ্র বসু সমগ্র দেশে নবজীবনের সঞ্চার করিয়াছিলেন।

বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে পরলোকগত বসুর প্রতিকৃতি মাল্যভূষিত করা হয় এবং সমিতির স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী জাতীয় পতাকাকে সামরিক অভিবাদন জ্ঞাপন করে। আশুতোষ কলেজের অধ্যক্ষ পঞ্চানন সিংহ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র বসুর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া এবং ১৯০৫ সাল হইতে বিপ্লববাদের ইতিহাস বিবৃত করিয়া ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জী বলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শে অনুশীলন সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতি দেশে যুগান্তর আনিতে চাহিয়াছিল। কৃষিপ্রধান সভ্যতার সঙ্গে বিদেশী শিল্পপ্রধান সভ্যতার সংঘর্ষের ফলে এদেশে বিপ্লব দেখা দেয় এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মগত শক্তি জাগরিত হয়।

অনুশীলন সমিতি 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিকে দেশে জনপ্রিয় করে এবং প্রতাপাদিত্য উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া দেশের সুপ্ত চৈতন্যকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করে। শ্রীঅরবিন্দ ধর্মের সঙ্গে দেশপ্রেমকে যুক্ত করেন। মানুষকে মানুষরূপে ফুটাইয়া তোলা সতীশবাবুর তপস্যা ছিল। সমগ্র দেশে বিপ্লব ছড়াইয়া দেওয়া অনুশীলন সমিতির উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহাদের সেই উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

তদানীন্তন সেচমন্ত্রী শ্রীযুত ভূপতি মজুমদার বলেন—আমাদের মনে রাখিতে হইবে—১৮৫৭ সালে যে প্রবাহ সুরু হইয়াছে, তাহাই স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপায়িত হইয়াছে। জাতির বাঁচিবার একটিমাত্র পথ আছে—তাহা হইতেছে ব্যক্তিগত জীবনকে সমষ্টিগত জীবনে বিলীন করিয়া দেওয়া। ব্যারিষ্টার পি. মিত্র, শশীভূষণ রায়চৌধুরী ও সতীশচন্দ্র বসু অদ্ভুত চরিত্রের লোক ছিলেন। তাঁহারা জনসাধারণের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করেন।

সতীশচন্দ্র বসুকে নিজের রাজনৈতিক গুরু বলিয়া উল্লেখ করিয়া শ্রীযুত হেমন্তকুমার বসু (ফরওয়ার্ড ব্লক) বলেন, যাঁহারা দেশের স্বাধীনতার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন, স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র বসু তাঁহাদের অন্যতম। সতীশ বসুর নেতৃত্বে অনুশীলন সমিতি সারা বাংলাদেশে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ১৯০৬ সালে অর্ধোদয় যোগের সময় যে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠিত হয়, সতীশবাবু তাহার পুরোভাগে ছিলেন। দেশের প্রতি গভীর ভালবাসা তিনি আমাদিগকে শিখাইয়া ছিলেন।

সতীশচন্দ্র বসুর জীবনী ও অনুশীলন সমিতির ইতিহাস বিবৃত করিয়া শ্রীযুত জীবনতারা হালদার লিখিত ভাষণ পাঠ করেন।

ডাঃ কুঞ্জেশ্বর মিশ্র, শ্রীযুত প্রভাত গাঙ্গুলী (সংবাদিক), শ্রীযুত শরৎচন্দ্র ঘোষ (ইতিহাসের অধ্যাপক) এবং শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ বসুও (বিজ্ঞানাচার্য্য) সভায় বক্তৃতা করেন।—"

ব্যারিষ্টার পি. মিত্র বা প্রমথনাথ মিত্র

প্রমথনাথ মিত্র (ব্যারিষ্টার পি. মিত্র নামে সমধিক পরিচিত) ১৮৫৩ সালের ৩১শে অক্টোবর তারিখে নৈহাটি শহরে (পশ্চিমবঙ্গ, জেলা ২৪ পরগণা) বাঙ্গালী কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম বিপ্রদাস মিত্র, পেশায় এঞ্জিনিয়ার। মাতা চপলা দেবী।

বাল্যকাল থেকেই তাঁর দুর্দমনীয় স্বাধীনতা-স্পৃহা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা পরিলক্ষিত হত—যে সকল উপাদানে তিনি পরবর্ত্তীকালে একজন বিপ্লবী নেতা হবার যোগ্যতা লাভ করেছিলেন। কিশোর বয়সে লাঠিখেলাই তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। এমন কি লাঠিকেই তিনি বাংলার জাতীয় অস্ত্র হিসাবে অ্যাখ্যা দেন।

হুগলী কলেজে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা লাভ হয়। মাত্র ১৫ বৎসর বয়সেই তিনি ইণ্ডিয়ান সিভিল সারভিস পরীক্ষা দেবার জন্যে বিলাতে যান।

ভারতবর্ষে ফিরবার পর তাঁর বিবাহ প্রসঙ্গে কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়। তখনকার প্রাচীন পন্থী সমাজের গোঁড়ামির ফলে তাঁর সমুদ্রযাত্রার অজুহাতে সমগ্র পরিবারকে জাতিচ্যুত করা হয়।

প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি বাগ্মী মনমোহন ঘোষের শ্যালক কাশীনাথ বসুর কন্যাকে বিবাহ করেন—গোঁড়া হিন্দুমতেই। দুর্ভাগ্য ক্রমে স্ত্রী বিনোদিনী দু বৎসরের মধ্যেই দেহত্যাগ করেন। তখন দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন আন্দুল নিবাসী সুরথনাথ মল্লিকের কন্যা সুরেন্দ্রবালাকে।

তাঁদের 'একঘরে' করবার আন্দোলন এত তীক্ষ্ণ হয়েছিল যে সমগ্র পরিবার খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হন। কিন্তু তিনি আজীবন নিষ্ঠাবান হিন্দুই থাকেন।

প্রমথনাথের ব্যবহারিক জীবন কিছু বৈচিত্র্যপূর্ণ। প্রথমে কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করবার জন্যে বারে যোগ দেন। কিন্তু প্রাথমিক চেষ্টায় সফলকাম হন নি। সেইজন্যে তিনি ছোট আদালতে ওকালতি করবার আয়োজন করেন। প্রথমে মেদিনীপুর যান, তারপর রংপুর। অবশেষে ২৫ বৎসর বয়সে বরিশাল বারে ভর্ত্তি হয়ে অভাবনীয় সাফল্য লাভ করেন।

এই সময়ে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়ের অনুরোধে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক হিসেবে রিপন কলেজে যোগ দেন এবং কলকাতায় ফিরে এসে পুনরায় হাইকোর্টে যোগ দেন। অল্পকালের মধ্যেই তিনি ফৌজদারী ওকালতিতে শীর্ষস্থানের অন্যতম অধিকারী বলে পরিগণিত হন। ক্রমশঃ অপরাধ নির্ণয়ে বিশেষ পারদর্শিতা ও খ্যাতি লাভ করেন।

একই সময়ে তিনি সাংবাদিকতাও আরম্ভ করেন। বেঙ্গলী, ইণ্ডিয়ান মিরর প্রভৃতি সংবাদপত্রে প্রভূত পরিমাণ রচনা প্রকাশ করেন। বাঙ্গালী জাতির শারীরিক উন্নতির জন্যে সংবাদপত্রে আন্দোলন শুরু করেন। মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা বিস্তারের পক্ষপাতী ছিলেন প্রমথনাথ।

এক সময়ে তিনি জাতীয় কংগ্রেসও যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু অচিরেই তাঁর মোহভঙ্গ হয়। ভিক্ষার রাজনীতিতে তাঁর কোন আস্থাই ছিল না। নিষ্ঠাবান জাতীয়তাবাদী হিসেবে তাঁর চরম পন্থাতেই বিশ্বাস ছিল। ব্রিটিশ পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচন একমাত্র সামরিক শক্তি দ্বারাই সম্ভব, এটাই ছিল তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়।

তিনি বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের একজন পথিকৃৎ ছিলেন। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে যে সমস্ত গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রমথনাথ তাদের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করতেন। ১৯০২ সালে কলকাতায় অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হল সতীশচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক ২৪নং মদন মিত্র লেনে, কার্য্যালয় হল ৪৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন তত্ত্বের নির্দেশ অনুযায়ী সমগ্র জাতের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও

আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যে। কিছু কাল পরে প্রমথনাথ এই সমিতির সংগঠন ও উন্নতি সাধনের জন্যে এর ডিরেক্টর বা সঞ্চালক পদে বৃত হন।

১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলনের উত্তাল মুহূর্তে বাংলার সর্বত্র (পূর্ব ও পশ্চিম) অনুশীলন সমিতির অসংখ্য শাখা স্থাপিত হয়। হাজার হাজার যুবক অনুশীলন সমিতির কোন না কোন কেন্দ্রে যোগদান করে এবং জন্মভূমির স্বাধীনতা লাভের জন্যে গোপনভাবে বিপ্লব প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়।

অনুশীলন সমিতির ঢাকার শাখাই সবচেয়ে শক্তিশালী ও দুর্মদ হয়ে ওঠে। স্বাভাবিক কারণেই প্রমথনাথ এখানকারও সঞ্চালক নির্বাচিত হন ও এর পরিচালনার ভার বিশ্বস্ত সহকর্মী পুলিন দাসের উপর ন্যস্ত করেন। সুতীক্ষ্ণ বিচক্ষণতার সঙ্গে এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে প্রমথনাথ এই সমিতি পরিচালনা করতে থাকেন। নিঃসন্দেহে এটাই তাঁহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব।

জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি এই সুবিশাল দায়িত্ব বহন করে-গেছেন। অবশেষে ১৯১০ সালের ১৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হয়ে অকস্মাৎ দেহত্যাগ করেন।

সেই সময়কার প্রথম শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে প্রমথনাথের নিবিড় যোগাযোগ ছিল। যে কেউ তাঁর সংস্পর্শে আসত তাকেই তিনি স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতেন। অগ্নিযুগের সুবিখ্যাত আলিপুর বোমার মামলায় তিনিই আসামীদের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন।

প্রমথনাথের সাহিত্যিক প্রাতিভাও ছিল উচ্চস্তরের। একদিকে ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি, আবার সংস্কৃতেও ছিল সমান পাণ্ডিত্য। হিন্দুধর্ম ও দর্শনশাস্ত্র তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। বিশেষতঃ যোগ সম্বন্ধেও তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। স্বয়ং নিয়মিত যোগাভ্যাস করতেন।

তিনি "যোগী" নামে একখানি উপন্যাস লিখেছিলেন। অন্যান্য বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—তর্কতত্ত্ব, জাতি ও ধর্ম এবং **History of the Intellectual Progress of India, etc.** (অধ্যাপক মানস মিত্রের সৌজন্যে)



রাসবিহারী বসু

লাঠি সেনাপতি পুলিনবিহারী দাস

প্রখ্যাত বিপ্লবী সংস্থা ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা ও সংগঠক প্রধান, বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম হোতা, খ্যাতনামা লাঠি ও অসি সঞ্চালক ব্যায়ামবীর পুলিনবিহারী দাস ২৮শে জানুয়ারী ১৮৭৭ সালে ফরিদপুর জেলার লোনসিং গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

পিতা নবকুমার দাস—মাদারীপুর বারের সর্বশ্রেষ্ঠ উকিল বলে গণ্য হতেন। মাতা স্বর্ণসুন্দরী দেবী বরিশালের অন্তর্গত শ্রেষ্ঠ কুলীন বসু বংশের মেয়ে ছিলেন।

বাল্যকাল হতেই তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি ঢাকা কলেজে বি. এ. অধ্যয়ন করতেন ও ১৯০৫ সালে ঐ কলেজেই অধ্যাপনাও করেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি নিজের ও অন্যান্য ছাত্রদের ব্যায়াম চর্চায় বিশেষ উৎসাহী ছিলেন এবং একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।

ছাত্রাবস্থায়ই পুলিন দাস বিপ্লবী মনোভাবেও উদ্বুদ্ধ হন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তিনি ছাত্রদের নিয়ে প্রথম প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলেন।

এই সময় তিনি কিছুকাল বিখ্যাত তুর্কী অসি-সঞ্চালক মার্ত্তাজার নিকট থেকে অসি ও ছোরা খেলার ক্রীড়াকৌশল শিক্ষা করে অনন্য-সাধারণ পারদর্শিতা লাভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্য লাঠি খেলাও শিক্ষা করেন। তিনি অসি, ছোরা ও লাঠি খেলার বিভিন্ন দিকে এত পারদর্শিতা লাভ করেন যে, লাঠি চালনা ও অসি ও ছোরা খেলায় তাঁর কৌশল ও বুৎপত্তি বাংলাদেশে একটা প্রবাদ হয়ে দাঁড়াল।

১৯০৫ সালে পুলিন দাস কলকাতার বিপ্লবী সংস্থা অনুশীলন সমিতির ডিরেক্টর ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্রের নিকটে বিপ্লব মন্ত্রের দীক্ষা

গ্রহণ করেন। ঢাকাতেই তাঁর দীক্ষা হয়। ঐ সময় পি. মিত্র এবং বিপিনচন্দ্র পাল ঢাকায় গিয়েছিলেন। এরপর ১৯০৬ সালে পুলিন দাসের উপরে সমগ্র পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গে অনুশীলন সমিতি গঠন করে তুলবার ভার অর্পিত হয়। এরপর থেকেই তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে ও সংগঠন শক্তির বলে অতি সত্বর পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে অনুশীলন সমিতির বৈপ্লবিক শাখা সমূহের প্রসার লাভ ঘটে। ১৯০৮ সালে যখন পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গে অনুশীলন সমিতিসহ বিভিন্ন সমিতি বে-আইনী ঘোষিত হল তখন বিভিন্ন স্থানে পুলিনবাবুর নেতৃত্বে অনুশীলন সমিতির প্রায় ৬০০ শাখা সমিতি ছিল।

বলিষ্ঠ পদক্ষেপে পুলিনবিহারী সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শক্তির সাথে প্রত্যক্ষ চরম সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলেন। বাংলার বাইরেও সমিতির কেন্দ্রবিস্তার লাভ করতে লাগল। ব্যাপারটা নজরে আসতে খুব বেশী দেরী হল না বৃটিশ সরকারের। সরকার ১৯০৮ সালে পুলিনবিহারীকে নির্বাসিত করলেন। ১৯১০ সনে মুক্তিলাভের পর তাঁকে ঐতিহাসিক ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার করে দীর্ঘ কারাদণ্ড দিয়ে আন্দামানে পাঠানো হল। সেখানে বীর সাভারকার প্রমুখ সর্ব-ভারতীয় কয়েকজন বিপ্লবী নেতার সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। মুক্তি-লাভের পর পুনরায় তিনি কাজ শুরু করলেন এবং শক্তি সাধনায় যুব শক্তিকে উদ্বুদ্ধ হবার বাণী প্রচার করতে লাগলেন। কলকাতায় বাদুড়-বাগানে, ১৯ বিদ্যাসাগর স্ট্রীটে, বঙ্গীয় ব্যায়াম সমিতি প্রতিষ্ঠা করে (১৯২৫ সালে) তিনি তাঁর সেই শক্তি সাধনার স্বপ্নকেই রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্য্যন্ত তিনি সেই সাধনাই করে গিয়েছেন।

ইং ১৯৪৮, ১৭ই আগষ্ট, বাং ১৩৫৬ সাল ৩০শে শ্রাবণ, এই বিপ্লবী বীরের জীবনাবসান হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৭৩ বৎসর হয়েছিল। পুলিনবিহারী দাসের আত্মজীবনীতে তাঁর কর্মবহুল জীবনের বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

বিজ্ঞান আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর পরিচয় আজ দেশবাসীকে দেবার প্রয়োজন করে না কারণ তিনি অবিসংবাদিত ভাবেই একজন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। আমার পরম গর্বের কথা সত্যেন্দ্রনাথ আমার কেবল বাল্যবন্ধুই ছিলেন না তিনি ছিলেন আমার সহপাঠী ও অভিন্ন হৃদয় অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমাদের বয়সও প্রায় একই। তাঁর জন্ম হয়েছিল কলকাতায়। পিতার নাম সুরেন্দ্রনাথ বসু। ১৯০৫ সালে আমরা দুজনেই অনুশীলন সমিতির সভ্য নির্বাচিত হয়েছিলাম। অনুশীলন সমিতির সভ্য হিসেবে আমরা যে কয়েকজন প্রথম সারির বিপ্লবী নেতার সংস্পর্শে আসি তার মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন "যাদুদা" বা ডাক্তার যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়। এ সম্বন্ধে পরে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে এখন কেবল সত্যেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত প্রসঙ্গেই ফিরে আসি। সত্যেন্দ্রনাথ বিজ্ঞান সাধনায় একজন অতি উচ্চস্তরের সাধক হয়েও চিরকালই ছিলেন একজন আদর্শ দেশপ্রেমিক এবং আজীবন বিপ্লব-বাদের একান্ত সমর্থক ও সক্রিয় সহযোগী। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন পদার্থ বিদ্যা বিশারদ। কোয়ান্টাম পরিসংখ্যানের তিনিই উদ্ভাবক ছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পঞ্চম (১৯০৯ সালে) আই এস সি-তে প্রথম ও গণিতে অনার্স নিয়ে বি. এ এবং ১৯১৫ সালে এম এ পাশ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন বিজ্ঞান কলেজে গণিত ও পদার্থ বিদ্যার ওপর গবেষণা সুরু করেন এই সময় মেঘনাদ সাহা (বিশিষ্ট বিজ্ঞানী)-র সঙ্গে তাঁর সাহচর্য ও ঘনিষ্ঠতা হয়। ১৯২১ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রীডার হিসেবে যোগ দেন ও দীর্ঘদিন যুক্ত থাকেন। তত্ত্বীয় পদার্থ বিদ্যা ও X-Ray Crystalography সম্বন্ধে গবেষণা করে বিজ্ঞান জগতে এক আলোড়ন আনেন। ১৯২৪

সালে তাঁর "প্লাঙ্ক সূত্র এবং কোয়ান্টাম প্রকল্প" নামে লেখাটি পড়ে আইনস্টাইন মুগ্ধ হন ও জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন। এই প্রদ্ধতিটি "বোস-আইনস্টাইন" পরিসংখ্যা নামে সারা বিশ্বে বিখ্যাত। ১৯৪৪ সালে সত্যেন্দ্রনাথ বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪৫ সালে ঢাকা থেকে এসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন এবং পরে পোষ্ট গ্রাজুয়েট সায়েন্স-এর "ডীন" পদে নিযুক্ত হন। দুই বৎসর তিনি বিশ্বভারতীর উপাচার্য ছিলেন। বিশ্ব-ভারতী তাঁকে দেশিকোত্তম ও ভারত সরকার পদ্মবিভূষণ উপাধি দিয়েছিলেন। ১৯৫৮ সালে তিনি লণ্ডনে রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন।

সত্যেন্দ্রনাথের সাহিত্য ও শিল্প প্রীতি এবং সঙ্গীতের বিশেষ জ্ঞান ছিল। তিনি এসরাজ ও বেহালা খুব ভাল বাজাতে পারতেন। তাঁর মানবিকতা বোধ ও ছাত্র প্রীতি বিখ্যাত ছিল।

দেশের উন্নতির জন্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তিনি "বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ" প্রতিষ্ঠা করেন এবং বাংলায় একটি বিজ্ঞান পত্রিকা "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" প্রকাশ করেন।

বিনোদবিহারী চক্রবর্তী

বিনোদ বিহারীর নাম এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে কারণে তা হল পুলিনদাসের একনিষ্ঠ সহকারী হিসেবে তিনি যে সাংগঠনিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন শুধু তাই নয়; পরে বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী হিসেবে এবং আরও পরবর্তীকালে যে রাজনৈতিক ভূয়োদর্শনের পরিচয় তিনি দিয়েছেন তাতে প্রমাণিত হয় যে, যে কোন স্বাধীন দেশের প্রথম সারির রাজনৈতিক নেতা বা স্টেট্‌স্‌ম্যান হবার যোগ্যতা তিনি জন্মগত ভাবেই পুরোপুরি লাভ করেছিলেন।

বিনোদ চক্রবর্তীর লেখা প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত অসংখ্য প্রবন্ধ ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণগুলির মধ্য থেকে সামান্য কিছু নমুনা এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হল পাঠকের অবগতির জন্যে।

বিনোদবিহারী চক্রবর্তী (১৮৯৩-১৯৪৭) ঢাকা জেলার শুভৈঢ্যা নামে একটি গ্রামে ১৮৯৩ খৃঃ আগস্ট মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক ভিটা ছিল শ্রীহট্ট বা সিলেটের অন্তর্গত লামাবাজার গ্রামে। পিতা রতনমনি চক্রবর্তী ছিলেন এক বিত্তশালী তালুকদার। শুভৈঢ্যা তাঁর পিসির বাড়ী। তিন বছর বয়সে মাতৃহীন হলে পিসিমাই তাঁর লালন-পালনের ভার গ্রহণ করেন। ১৯০৩ সালে পিসেমশাই বিনোদকে নিজের কর্মস্থান জলপাইগুড়ি নিয়ে গিয়ে জিলা স্কুলে ভর্তি করে দেন। বছর দুই পর তাঁকে ঢাকাতে ফিরিয়ে এনে জুবিলী স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি করে দেওয়া হয়। সেটা ছিল ১৯০৫ সালের গৌরবময় বঙ্গ বিপ্লবের প্রথম বৎসর।

ঢাকায় পড়তে এসেই বিনোদ পুলিন দাসের সংস্পর্শে এলেন। সেই সঙ্গে পুলিনদাসের আখড়া অর্থাৎ অনুশীলন সমিতির সঙ্গেও তাঁর পরিচয় এবং হাতেখড়ি। সেই থেকেই বিনোদ হলেন অনুশীলন সমিতির সক্রিয় সদস্য। তাঁর বিস্ফোরক চরিত্র অচিরে তাঁকে অতিচিহ্নিত করে ফেলল অনেকের কাছেই। সুতরাং সরকারী নজরের আড়াল করার

জন্য তাঁকে National Council of Education পরিচালিত National School বা জাতীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি করে নেওয়া হল। তখন ঐ জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন চার্লস্ ড্যানিয়েল নামে এক ভারতীয় খৃষ্টান। তিন বছর পর যখন বিনোদ দশম শ্রেণীর ছাত্র তখন পুলিশের বিশেষ নজর পড়ল তাঁর ওপর। ষোল বছর বয়স তখন তাঁর। পুলিশের দৃষ্টি থেকে আড়াল করার জন্যে তাঁকে শুভৈঢ্যাতে পাঠিয়ে দেওয়া হল। তাঁর বাবা বিনোদকে লামাবাজারে তাঁর তালুকদারির কাজ দেখাশোনার জন্যে চলে আসার জন্যে পীড়াপীড়ি করায় তিনি চিঠিতে জানালেন—"আপনার তালুকদারির কাজ দেখার পরিবর্তে সমস্ত ভারতবর্ষের তালুকদারির কাজ এখন আমার সেবার অপেক্ষায়। আমাকে ক্ষমা করবেন।"

পর বৎসর ১৯২২ সালে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। পরবর্তীকালে বিনোদ কোনদিন পৈতৃক জমিদারী ও বিষয় সম্পত্তির কোনও খোঁজই রাখেননি। এর অনেক আগেই (১৯১০ সালে) তাঁর পরিচয় হয়েছিল বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত ও অধ্যাপক বিনয় সরকারের সঙ্গে। ঢাকার কাছে শানিহাটি গ্রামে ছিল বিনয় সরকারের পৈতৃক বাসস্থান। সেখানে একটি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি পরিচালিত হত মালদহের জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধীনে। এই দুটি প্রতিষ্ঠানেরই প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ছিলেন বিনয় সরকার। এরপর বিনোদের কর্মস্থল হল মালদহে বিনয় সরকারের নির্দেশে। বিনয় সরকারের সঙ্গে বিনোদের এই পরিচয় হল মণিকাঞ্চন যোগ। কারণ বিনয় সরকার ছিলেন প্রকৃত অর্থেই মানুষ গড়ার কারিগর।

মালদহ জাতীয় শিক্ষা পরিষদে বিনোদ ভর্তি হলেন একই সঙ্গে ছাত্র এবং শিক্ষক হিসেবে। কারণ বিনয় সরকার ময়মনসিংহের মুক্তা-গাছার রাজবাড়ীতে একটি শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মুক্তাগাছার রাজপরিবারের সহায়তায়। ঐ বিদ্যালয়ে বিনোদ শিক্ষক হিসেবে বেশ কিছুদিন ছিলেন। এতে একই সঙ্গে তিনি পুলিশের নজরের বাইরে রইলেন এবং শিক্ষক হিসেবে মুক্তাগাছার রাজকুমারদের তত্ত্বাবধানের কাজে

থেকে ঐ পরিবারের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসেন। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যে কয়েকটি অভিজাত পরিবার প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষে প্রকৃত দেশপ্রেম ও দেশবাসীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন মুক্তা-গাছার রাজপরিবারের নাম তাঁদের মধ্যে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এই পরিবারের দান ও আর্থিক সাহায্য সমগ্র দেশ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করবে।

মালদহে থাকার সময়েই বিনয় সরকার সম্পাদিত মাসিক 'গৃহস্থ' পত্রিকার সঙ্গে বিনোদের আত্মিক যোগাযোগ শুরু হয়। মালদহের ত্রৈমাসিক 'গম্ভীরা' পত্রিকার সঙ্গেও তাঁর অনুরূপ সম্পর্ক কায়েম হয় ওই সময়েই। বিনোদ গৃহস্থ পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন। এ ছাড়া দৈনিক এবং সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলোতেও তাঁর লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে। লেখার বিষয়বস্তু ছিল বাঙালীর অর্থনৈতিক সমাজ জীবন। ১৯১৪ সালে বিনয় সরকার বিশ্ব পর্যটনে বেরোন। ফলে গৃহস্থ পত্রিকার অনেকখানি দায়িত্বই এসে পড়ে বিনোদের ঘাড়ে।

১৯১৪ সালে বিনোদের পরিচয় হয় অমর চ্যাটার্জীর "সমজীবি সমবায়"এর সঙ্গে। তখন "সমজীবি সববায়"এর কর্মকেন্দ্র ছিল কলকাতার হ্যারিসন রোডের এক বাড়িতে। ওই বছরেই বিনোদের যোগাযোগ ঘটে আরেক মহাবিপ্লবীর সঙ্গে। তিনি হলেন বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে জার্মানীতে স্থাপিত হল ভারতীয় বিপ্লবীদের "বার্লিন কমিটি"। বাংলা দেশে বার্লিন কমিটির শাখা স্থাপিত হলে তার নেতৃত্বের ভার দেওয়া হয় বিপ্লবী বীর যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ওপর। 'সমজীবি সমবায়'এর কাজ ছিল দেশ-বিদেশ (বিশেষভাবে জার্মানী) থেকে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা। বিনোদ অনুশীলন সমিতির কর্মী হলেও অন্য সব বিপ্লবী দলের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সদ্ভাব ও যোগাযোগ ছিল। সেদিনে তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে ছিলেন কেদার সেন, সোনার বাংলা সম্পাদক নলিনী গুহ, রবি সেন, সাংবাদিক মাখন সেন, পরবর্তীকালে দেশ সম্পাদক বঙ্কিম সেন, ত্রৈলোক্য

চক্রবর্তী (মহারাজ), নরেন্দ্র ভট্টাচার্য, সূর্য সেন (মাষ্টারদা), বসুমতী সম্পাদক উপেন বন্দোপাধ্যায় ইত্যাদি।

রাসবিহারীর নেতৃত্বে ভারতের বিপ্লবীরা দিন গুনছিলেন জাতীয় অভ্যুত্থানের। রাসবিহারী বসু তখন পিংলে, কর্তার সিং প্রভৃতির সাহায্যে দেশীয় সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ সৃষ্টি করার আয়োজন করে-ছিলেন। প্রথমে দিন ঠিক হয় ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী। ইংরেজ সরকার কোনোক্রমে ঐ দিনটির কথা জেনে গেলে বিপ্লবীরা ২১ তারিখের বদলে ১৮ই ফেব্রুয়ারী ঠিক করেন। পরে সেদিনের কথাও ইংরেজ সরকার জানতে পারায় অভ্যুত্থান ভেস্তে যায়। ভারতে এই অভ্যুত্থান সফল না হলেও সিঙ্গাপুরে বিদ্রোহ পুরোপুরি সফল হয়। সমস্ত সিঙ্গাপুর একুশ দিনের জন্য বৃটিশ সরকারের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। সেই বিপ্লবের নাম বৃটিশ সরকার দিয়েছিল লাহোর-সিঙ্গাপুর ষড়যন্ত্র। এরপরে সারা ভারতে দারুণ ধরপাকড় শুরু হয়ে যায়। পিংলে মীরাটে বোমা সমেত ধরা পড়লে রাসবিহারী বসু কলকাতায় পালিয়ে আসেন। যতদিন রাসবিহারী কলকাতায় ছিলেন ততদিন তাঁর নিরাপদে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা এবং অন্য সব কাজের বন্দোবস্ত করার ভার পড়েছিল বিনোদের ওপর। খিদিরপুর ডকে জাপানী জাহাজে যেদিন রাসবিহারী জাপান যাত্রা করেছিলেন সেদিন পর্যন্ত তাঁর পাশে ছিলেন বিনোদ এবং শচীন সান্যাল। রাসবিহারীর সঙ্গে সেই তাঁর শেষ দেখা।

১৯১৬ সালে বিনোদ পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন। তাঁকে অন্তরীণ করা হল কুতুবদিয়ায়। সেখান থেকে তাঁকে আনা হল চট্টগ্রামে। তারপর নেওয়া হয় নোয়াখালিতে। নোয়াখালি থেকে বিপ্লবীরা পালাবার চেষ্টা করে পারেন নি। তারপর নিয়ে যাওয়া হয় সুন্দরবনে পাথর প্রতিমা দ্বীপে। বিনোদের প্রথমবারের বন্দী জীবন সাঙ্গ হল ১৯২০ সালে।

১৯২১ সাল বিশেষভাবে স্মরণীয়। কারণ সে বছরই শুরু হয় গান্ধীজির অহিংস আন্দোলন। এই নির্বীর্যতার বিপক্ষে বিপ্লবীরা প্রতিবাদ স্বরূপ প্রকাশ করলেন 'হক কথা' নামে তাঁদের মুখপত্র।

'হক কথা'র ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা ছুটোই লিখেছিলেন বিনোদ। এর কিছুদিন পরে বিনোদ কিছু বিপ্লবীদের নিয়ে আমহার্স্ট স্ট্রিট ও হ্যারিসন রোডের মোড়ে খোলেন "মিরর প্রিন্টিং ওয়ার্কস"। সেটা বন্ধ হল পুলিশের উৎপাতে। তারপর কয়েকজন বিপ্লবীর চেষ্টায় আত্মপ্রকাশ করল 'শঙ্খ' পত্রিকা। 'শঙ্খ' পত্রিকা চললো ১৯২২ থেকে ২৫ সাল পর্যন্ত। এই পত্রিকার অন্যতম পরিচালক ছিলেন বিনোদ। এই পত্রিকায় ইউরোপ থেকে নিয়মিত লিখতেন অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার এবং ডক্টর ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত।

১৯২৫ সালে প্রকাশিত হল বিনোদের লেখা দুই ইতালিয়ান বিপ্লবীর জীবনী 'লিওনিদাস' ও 'রেগুলাস' বই দুইটি।

১৯৩২ সালে প্রকাশিত হয় "আব্রাহাম লিঙ্কল্ন্"। সে বছরেই প্রকাশিত হল বিনোদের লেখা আরেকটি জীবনী "জেমস্ আব্রাম গারফিল্ড"।

১৯৩২ সালের আগষ্ট মাসে মানিকতলা মেন রোডের ওপর কোনো এক মেস বাড়ি থেকে বিনোদকে আবার গ্রেপ্তার করা হয়। ভারত রক্ষা আইনে এবার বিনোদকে কারাগারে থাকতে হয় ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত। প্রথম পাঁচ বছর তাঁকে রাখা হয় রাজপুতানা ও উত্তর প্রদেশের ক্যাম্প গুলোতে। শেষ বার রাখা হয় যশোহর জেলার ঝিকরগাছায়। জেলে থাকতে লিখলেন তিন খানা বই। (১) জার্মান সম্রাট কাইজার হ্বিলহেল্ম (২) বিসমার্ক (৩) ক্যাপরিভি। এ সময়েই লেখা শুরু করেন ভারতে বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস। এই বইটি লিখতে শুরু করেছিলেন বিপ্লবী পুলিন বিহারী দাসের অনুরোধে।

১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হল 'শিক্ষা নায়ক আশুতোষ' বইটি। ১৯৩৮ সালেই বিনোদের কারাবাসের মেয়াদ ফুরোয়।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হল। ওই বছরে তিনি মধ্য কলকাতার কপালী টোলায় একটি ছাপাখানার ম্যানেজারগিরির কাজে যোগ দেন। তাঁকে দিনরাত পুলিশের কড়া নজরের মধ্যে তখন থাকতে হত। ১৯৪২ সালে প্রেসের কাজ ছেড়ে দিয়ে

তিনি আবার লেখালেখির কাজে ডুবে গেলেন। ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনের মধ্যে বিনোদের প্রথম উপন্যাস 'যুথভ্রষ্ট' প্রকাশিত হয়। এই সময় বছর দুইয়ের জন্যে বিনোদ কলকাতা থেকে উধাও হয়ে আত্মগোপন করেন কাঁচড়াপাড়ায়। ১৯৪৪ সালে কলকাতায় ফিরে এসে কলেজ স্কোয়ারে বিখ্যাত সঞ্জীবনী প্রেসে ম্যানেজারের পদে ঢুকলেন। দেশের রাজনৈতিক জীবনে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কৃষ্ণকুমার মিত্রের সঞ্জীবনী পত্রিকার ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গৌরবজনক। এই প্রেসের অফিসেই তাঁর শেষ দিনটি পর্যন্ত অতিবাহিত হয়। এই সময়ে রাজনৈতিক প্রবন্ধের সঙ্গে ফাঁকে ফাঁকে তিনি লিখেছেন কয়েকটি ছোট গল্পও। 'বাঁশীওয়ালা', 'মৃদঙ্গ ব্যবসায়ী' এবং 'যাদব ডেপুটি' ইত্যাদি। বিনোদের গল্পের হাতও ছিল ভারি মিষ্টি।

১৯৪৫ সালের শেষ দিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধও শেষ হল। শুরু হল ভারতীয় রাজনীতির নতুন অধ্যায়। অখণ্ড শাশ্বত গৌরবময় ভারতবর্ষকে স্বার্থ অন্বেষী কিছু রাজনৈতিক নেতার দল যে হীনবুদ্ধির বশে টুকরো টুকরো করার খেলায় মেতে উঠলেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি লিখতে শুরু করেন 'স্বাধীনতা চাই' (১৯৪৪ সালে) এবং ক্যাবিনেট মিশন নিয়ে ভারতীয় রাজনীতির বিশ্লেষণ (১৯৪৬ সালে)। ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হল "ফ্রীডরীশ লিষ্ট ও জার্মানী"।

যে বিপ্লবী সারা জীবন দেশের মঙ্গলের কামনায় দিন গুনেছেন তাঁকে আর শেষ পর্যন্ত দেশমাতৃকার অঙ্গচ্ছেদ দেখতে হয়নি। সামান্য অসুস্থতার পর কলেজ স্কোয়ারের সঞ্জীবনী প্রেসের অফিস ঘরেই বিনোদের জীবনাবসান ঘটে ৯ জুলাই ১৯৪৭ সালে।

ভারতে বিপ্লববাদ কেন ব্যর্থ হয়েছিল, সুবিধা বাদী নেতৃবৃন্দ কেমন করে দেশের বৃহত্তর স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে নিজের নিজের আখের গোছাবার ব্যবস্থা করেছিলেন ; কেমন করে দেশের অঙ্গচ্ছেদের পথ বেছে নিয়েছিলেন দেশের একদল স্বার্থপর নেতা ক্ষমতা লাভের আশায়-এই নিয়েই বিনোদ লিখেছিলেন ১৯৪৬ সালের ক্রিপস্ বা ক্যাবিনেট মিশন নিয়ে তৎকালীন ভারতীয় রাজনীতির বিশ্লেষণ। সেটাই এর পরবর্তী পরিচ্ছদে আবার মুদ্রিত করা হল আজকের পাঠকের অবগতির জন্যে।



ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়

ক্যাবিনেট মিশন ও ভারতীয় রাজনীতির বিনোদী বিশ্লেষণ

"কি শুনিরে আজি পুরি আর্য্য দেশ
কেন বা আজি এমন হয়,
বৃটিশ শাসিত ভারত ভিতরে
কেনরে সবে বলিছে জয়!"

সমাজ আজ রাষ্ট্র। রাষ্ট্র আর সমাজ। এ দুইয়ের সম্বন্ধ বড়ো নিবিড়। এদের একেকে বাদ দিয়ে অপরকে চিন্তা করা যায় না কোনোমতেই। সুস্থ, সবল আর প্রাণবন্ত যে দেশের সমাজ, শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়তে পারে একমাত্র সে দেশই। সুস্থ সমাজ আর সুশৃঙ্খল রাষ্ট্র এ দুয়ে মিলেই গড়ে ওঠে একটা প্রাণবন্ত "জাতি" বা "নেশান"। তাই দেশের যাঁরা বড়ো বড়ো রাষ্ট্রধুরন্ধর, তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে হতে হবে পয়লানম্বরের সমাজনীতিবিদ্‌ও বটে। রাষ্ট্র গড়ার কৌশল শিখতে হলে জানা চাই সুস্থ-সবল সমাজদেহ গড়ার মন্ত্রটা। আমাদের দেশে যেদিন সমাজ ছিল জীবন্ত, লোকগুলো ছিল প্রাণপ্রাচুর্য্যে, ভরা, আমাদের সংস্কৃতির জাহাজ পণ্য বোঝাই হয়ে সাহস আর শৌর্য্যের পাল তুলে ছুটেছে সেদিন পৃথিবীর আনাচে-কানাচে, পাহাড় ডিঙ্গিয়ে, সাত সাগর পেরিয়ে, মরুভূমি অতিক্রম করে জংগল কেটে নগর বসিয়ে গড়েছে তারা সেদিন দিকেদিকে উপনিবেশরূপ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। মুগ্ধ বিস্ময়ে বিশ্ববাসী সেদিন শ্রদ্ধাভরে শুনেছে আমাদের চিন্তানায়কদের জ্ঞানের কথা। আমাদের সমাজ ছিল সেদিন জীবন্ত। সমাজনায়কেরাও ছিলেন তাই প্রাণবন্ত আর দরদী। কিন্তু সে অনেক দিনের কথা হাজার বছরেরও বেশী। আমাদের পরাধীনতা শুধু দুশো বছরের ইংরেজ শাসনে নয়, আমাদের পরাধীনতার সুরু সেদিন, যেদিন সুলতান মহম্মদ করেছে ভারত আক্রমণ, আমাদের গোলামীর সুরু সেদিন, যেদিন মহম্মদ ঘোরী প্রথম করেছে ভারতে প্রবেশ। ভাবলে আশ্চর্য্য লাগে,

যে দেশের যুবশক্তির সামনে একবার ভয়ে সম্রাট আলেকজেণ্ডারের বিশ্বজয়ী সেনাদল পুরুর দরজা পর্য্যন্ত এসেই পলায়ন করেছে, যুদ্ধে পরাজিত হয়ে নয়, শুধু ভারত সম্রাট নন্দের সৈন্যবল আর তাদের যুদ্ধকৌশলের কথা লোকমুখে শুনে; সেই দেশের ক্ষাত্রশক্তি হার স্বীকার করেছে নগণ্য এক পার্বত্য দস্যুসর্দার মহম্মদ ঘোরীর হীন চক্রান্তের কাছে।

তারপর এই হাজার বছরের ভেতর আমাদের দেশে চাণক্য, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, শুক্রাচার্য্য জন্মাননি আর একজনও। নতুন সমাজনীতি তৈরী হয়নি আর একটাও। সৃষ্টি হয়েছে যা, তা হচ্ছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জমে ওঠা কুসংস্কার আর আবর্জনার পর্বতপ্রমাণ স্তূপ একটা। আর এই আঁস্তাকুড়ের আড়ালে বসে উচ্ছিষ্ট নিয়ে মহা আনন্দে লাফালাফি করছি আমরা যতো ফাঁকিবাজের দল। এই হল আমাদের আজকের সমাজ।

জগদ্‌বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা আইরিশ পিয়ার্স জিজ্ঞাসিত হইলে, হোমরুল সম্বন্ধে এই উত্তর দিয়াছিলেন, "যদি তা আসে আসুক! যদি আমার এক হাতের বাঁধন কোনোরকমে খুলিতে পারি তাহা হইলে আর এক হাতের বাঁধন সহজেই খুলিতে পারিব।" তাই কি আজ এ দেশের অর্থাৎ ভারতের অনেক লোকেই ক্যাবিনেট মিশনের এই পরম অকপটতায়—এই চরম রাজনীতিক বদান্যতায়—এত খুসী? তাই কি আজ যাহারা এ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ প্রকাশ করিতেছে তাহাদের উপর তাহারা শুধু বিরক্তই হইতেছে না, তাহারিগকে বোকা-বেকুব, ইংরেজ-চরিত্র সন্দিহান বলিয়া অমানুষ বিবেচনাও করিতেছে। আর অতঃপর যে তাহাদিগকে দেশদ্রোহীও বলিতে পারে এমন সম্ভাবনাও যথেষ্ট আছে!

ক্যাবিনেট মিশন যে কয়দিন এ দেশে থাকিবেন সে কয়দিন এ দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হউন, আপত্তি নাই ; দেশে ফিরিবার সময়, এ দেশবাসীর অজস্র শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত আশীর্বাদ বহন করিয়াও লইয়া যাইবেন, আশা করি, তাহাতেও আপত্তি নাই। কিন্তু যে কোনো ইংরেজ রাজনীতিককেই উদার হৃদয় বলিয়া শ্রদ্ধা-ভক্তির অর্ঘ্য দিতে আমার যথেষ্ট আপত্তি আছে। এটা বিচার-বিবেচনার জগৎ, দর-কষাকষির বাজার, হার-জিতের ময়দান, বাঁচা-মরার সমস্যা 'সমাধানের ক্ষেত্র ; এটা চরিত্রবলের সংগে চরিত্রবলের কঠোর পরীক্ষার স্থান। কাজেই, বিষয়টা বিচার সাপেক্ষ। ইংরেজদত্ত এই রাজনীতিক দানটা এক্ষণি লইবার জন্য ব্যস্ত যাহারা হইয়া পড়িয়াছে, পরিণামে ঠকার দায় এড়াইবার জন্য আগে তাহাদের সামাজিক মূল্যটা বিচার করিয়া দেখা দরকার। তিতাটা আগেই ভাল। ইহাদের মধ্যে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম শ্রেণীভুক্ত যাহারা তাহারা যেহেতু বিচার বুদ্ধিহীন, কাজেই অক্ষরজ্ঞানমাত্র সম্বল ; অল্পপ্রাণ, ভগ্ন-মেরুদণ্ড, কিন্তু মহাজ্ঞানী বলিয়া গর্বিত ; সহজে সুবিধা পাগল ; কোনোরকমে জীবনযাপনে সুখী ; জন্তু-বিশেষের মতো অল্পে তুষ্ট ; নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ সম্বন্ধে সদাজাগ্রত : দেশের স্বার্থ সম্বন্ধে চিরদিন কার্য্যতঃ উদাসীন ; মান-অপমানে দ্বিধাহীন ; ক্ষুদ্র দৃষ্টি ; শিক্ষা, সংস্কৃতি, অন্তরের ব্যাপকতা ও চরিত্রবলের বিকাশে ইহারা নিরুদ্যম ; ইহারা মনে করে অন্ধকার আঁস্তাকুড়ও অতি উত্তম স্থান। ইহারা বর্বর নয়, কিন্তু বেকুব। আর ইহাদের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত লোকেরা বিত্ত-সম্পত্তির মালিক বলিয়া ব্যক্তিগত স্বার্থসম্বন্ধে সদা-হুশিয়ার ; ইহাদের ক্ষুধা নিজেদের জন্য। এমন কোনও মতে ইহারা সায় দিবে না যাহাতে ইহাদের আয়ের উপর আয় বৃদ্ধি বন্ধ হইতে পারে। কাজেই ব্যক্তিগত স্বার্থ যেখানে প্রবল সেখানে আর কোনো মহতী চিন্তাই স্থান পাইতে পারে না। অতএব ইহাদের কাহারও পরামর্শ গ্রহণযোগ্য নহে। তবে যাহারা উল্টা মতের তাহাদের মূল্যটাও কতোখানি, একবার ভাবিয়া দেখা দরকার ; আর কেনই বা তাহারা উল্টা মতের ! লাভের দিকটা কি শুধু তাহারাই

বুঝে যাহারা ত্বরিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে ; আর যত বোকা-বাঁদর কি তাহারাই যাহারা ইহাকে পাওয়া মাত্র মাথায় তুলিয়া লইতে পারে নাই !

এই মিশনকে আমরা ভারতের রাজনীতিক রঙ্গমঞ্চে বিভিন্ন অঙ্কে বিভিন্ন রূপে দেখিয়াছি। প্রথমবার ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের যুগে, "মর্লিমেন্টো শাসন-সংস্কার"রূপে ১৯০৯ সালে : দ্বিতীয়বারে "মন্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার"রূপে ১৯১৯ সালে ; তৃতীয়বারে "সাইমন কমিশন"রূপে ১৯২৮ সালে আর এই চতুর্থবারে "ক্যাবিনেট মিশন"রূপে ১৯৪৬ সালে। প্রথম যুগটা সম্বন্ধে একটু বিশেষ করিয়া বলিবার আছে এই যে, ১৯১১ সালে অর্থাৎ ১৯০৯ সালের শাসন-সংস্কারের জেরস্বরূপ দুই বৎসরের ভিতর রাজা স্বয়ং অভিষেক উপলক্ষে এ দেশে আসিয়া বঙ্গভঙ্গ রদ করিয়া দেন। আরও বিশেষত্ব এই যে, যিনি বঙ্গভঙ্গ যজ্ঞের হোতা সেই লর্ড কার্জনও সম্রাটের সংগে উপস্থিত ছিলেন। এখন এই সদ্য শাসন-সংস্কারের কার্য্যকারণ নির্ণয় করা দরকার।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হইল। ইহার সূচনা হইয়াছিল ১৯০৫ সালের ৭ই আগষ্ট—বিলাতী জিনিষ বর্জন উপলক্ষে। এই বিষয়টি সর্বপ্রথম প্রচারিত হইয়াছিল "সঞ্জীবনী"তে। সমগ্র দেশ এই পরামর্শ সদ্‌যুক্তি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। সমুদয় বাংলা দেশ বিলাতী বর্জনের আন্দোলনে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। ইহা যে একটা সতেজ বৃক্ষের সুপক্ক ফল তাহা বলাই বাহুল্য। ইংরেজের জীবন শিল্পে-বাণিজ্যে। তাহাকে এইভাবে ভাতে মারার ব্যবস্থা করায় ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট রাগিয়া উঠিল। সমুদয় বাংলা দেশে জোর মারপিট চলিল। দলে দলে লোক জেলে গেল। পুলিশ জুলুমের পাল্টা উত্তর দিল—বাংলার যুবকদের বোমা, রিভলবার ইত্যাদি। গবর্ণমেণ্টকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যই সম্ভবতঃ ডাকাতি দেখা দিল। ইহার ফলস্বরূপ স্বদেশী গান গাওয়া বন্ধ হইল, বক্তৃতা বন্ধ হইল, নাটক বন্ধ হইল ; অনুশীলন সমিতি ও অন্যান্য ছোটখাটো দল নিষিদ্ধ বলিয়া জারী হইল। এইভাবে সাধারণ

লোকের সাধারণ ব্যাপার বন্ধ হইল। বাছা বাছা নেতারা নির্বাসিত হইলেন। সারা বাংলা দেশ জুড়িয়া ষড়যন্ত্র মামলা আরম্ভ হইল। ইহাতেও যখন একদল লোক গোপনে বিপ্লবাত্মক কাণ্ড ঘটাইয়া গবর্ণমেণ্টকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল তখন আসিল "মর্লিমিণ্টো শাসন-সংস্কার।" এরূপ সুযোগ একদল লোকের ভাগ্যে চিরদিনই ঘটিয়া আসিতেছে। কিন্তু যাহাদের কর্মের ফলে এরূপ ঘটিল তাহারা যে ইহা হইতে বহু দূরে। হয়ত তাহারা ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। তাহারা যে নীতি—ভুলই হউক আর ঠিকই হউক—গ্রহণ করিয়াছিল, সেই পথ ধরিয়াই চলিতে লাগিল। তাহাদিগকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট এক সহজ উপায় করিলেন—বঙ্গভঙ্গ রদ করিবার প্রস্তাব করিয়া। যথাসময়ে ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গ রদ হইয়া গেল। নদীর পূব পারের ভাঙ্গন বন্ধ হইল, কিন্তু নূতন ব্যবস্থায় ভাঙ্গনটা দেখা দিল পশ্চিম পারে—ছোট নাগপুর, বিহার আর উড়িষ্যা, বাংলা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ভাঙ্গাকে জোড়া দিয়া ইংরেজ নিশ্চিন্ত হইল; ভাঙ্গা জিনিষ আবার আস্তা ফিরিয়া পাইয়া সাধারণ লোকেরা সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। এই সাধারণ লোক কাহারা? আজিকার দিনের সাধারণ লোকদের পূর্বপুরুষেরা। কিন্তু ইহাতেও বিপ্লবীরা থামিল না। ইহারা যে কাহারা তাহা জানিবার কোনোই উপায় নাই; তবে ইহারা যে বাঙ্গালী সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ, কি গবর্ণমেণ্টের, কি শান্তিপ্রিয় দেশবাসীর কাহারওই রহিল না। এখন কথা এই যে, এই বিপ্লবীরা কি জন্য এমন বেমক্কার মত চলিতেছিল! সহজ উত্তর—দেশের গাছগাছড়া, নদীনালা, খালবিল হইতে মানুষ অবধি সব কিছুর জন্যই ইহারা মরিতে বসিয়াছিল; হয়তো এই জন্যই যে, এই ভাঙ্গা-গড়ার কর্তৃত্বটা, আর একজন যার সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ নাই, সংস্কৃতির সম্বন্ধ নাই, বাঁচা-মরার সম্বন্ধ নাই, গৌরব-অগৌরবের সম্বন্ধ নাই, সমাজ-জীবনের কোনো সম্বন্ধ নাই—তাহার হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া নিজের হাতে আনিয়া সকল হাঙ্গামার নিবৃত্তি এক দিনেই করিতে চাহিয়াছিল।

এখন একটা কথা জিজ্ঞাস্য এই হইতে পারে যে, ১৯০৫ সালের বিষয়টা এত ভয়ঙ্কর হইয়া দাঁড়াইবার আসল কারণটা কি ? ইহার বিশ বৎসর আগেই তো দেশে ; আজিকার কাউন্সীল এসেম্ব্লী, যার জন্যে লোকের আগ্রহের অন্ত নাই তার পূর্বপুরুষরূপ স্বায়ত্তশাসনপ্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল ; তবে কেন এমন হইল ! সহজ কথায় রামমোহন হইতে রামমোহনের পরবর্তীকালের জীবিত ও পরলোকগত সকল মনীষীই দেশের স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। যাঁহারা সংসার হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছিলেন, একদিকে কাজ করিতেছিল তাঁহাদের সাহিত্য আর একদিকে কাজ করিতেছিল জীবন্ত ধুরন্ধরদের কার্য্যাবলী। দলে দলে স্বার্থত্যাগী কর্মবীরদের অভাব যেমন ঘটে নাই, প্রাণবন্ত ছাত্রদলের অভাবও তেমনি ঘটে নাই। দেশ মা,—মায়ের অঙ্গচ্ছেদ সন্তান সহ্য করিতে পারে না। যে নবজাত শিশু সেদিন মাতৃহারা হইয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল ধীরে ধীরে বড় হইতে হইতে ছয় বৎসরের প্রতিটি দিবসে সে ক্ষোদাই করিয়া রাখিয়া যাইতেছিল তাহার বিক্রমের কথা। প্রথম দিনের বেদনার প্রতিশোধ লইবার জন্য তাহার শিশু-দুর্বল হাতে যে অস্ত্র সে ধরিয়াছিল তাহা যে এত অব্যর্থ তাহা বুঝিতে কাহারো বাকী রহিল না। অন্তরের রুদ্ধ আবেগ, মস্তিষ্কের জোরালো যুক্তির খাতে মিশিয়া ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। তখন বাংলা দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা ছিল কত ? গীতা আর বিবেকানন্দ-সাহিত্যকে পান করিয়া এই শিশু বাংলা সেদিন ছড়াইয়াছিল নূতন ধরণের এক বিপ্লব সাহিত্য। সাহিত্যে এবং সমাজ-জীবনে নব নব চিন্তার ধারা বহন করিয়া জাতীয় ভাগ্যাকাশে দেখা দিয়াছিলেন নব নব দিক্‌পাল।

এত কথা যে এখানে বলিলাম, আর ইহার পরেও যাহা বলিব, তাহার প্রয়োজন হইবে মিশনপ্রদত্ত দানপত্র বিচারের সময়। এই সময়টার কথা ভুলিলে চলিবে না।

এখন আমরা লক্ষ্য করিয়া চলিতে থাকিব, ১৯১১ সালের পরবর্তী-কালের শিশু বাংলাকে। ১৯১২ সালে দেখিতে পাই বাংলার শিশু বিপ্লবী বাংলা দেশ ছাড়িয়া এক দৌড়ে পাঞ্জাবে হাজির। সে একদিকে

খেলা করিতেছে পাঞ্জাবে, যুক্তপ্রদেশে আর একদিকে খেলা করিতে লাগিল বাংলা দেশে। এই সময়ের ইতিহাসে দেখিতে পাই, একই সময়ে রক্ত আর আগুনের খেলায় আশ্‌মান জমিন গুলজার! এত বৃদ্ধি ইংরেজের সহ্যসীমার বাহিরে ;—জারী হইল ডিফেন্স অব্‌ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট। বিপ্লব-শিশু বুড়ো আঙ্গুল দেখাইয়া আপন মনে আপনি চলিতে লাগিল। তারপর একি লাহোর আর বেনারস ষড়যন্ত্রের মামলা! আর তো ইহাকে শিশু বলা চলে না! রাওলপিণ্ডি হইতে দানাপুর অবধি দুর্গে দুর্গে সে হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে, বাংলা দেশে তাণ্ডব নৃত্য সুরু করিয়াছে—সে নৃত্যের আসর ব্রহ্ম আর সিঙ্গাপুর অবধি বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। ইংরেজ সৈন্যদল লইয়া ব্যতিব্যস্ত—বিশ্বাস করিবার মতো এ দেশে যে আর কেহ নাই! বাংলা আর পাঞ্জাবে বিনা বিচারে আটক হইল দশ হাজার ; জেলে গেল হাজার পাঁচেক ; আর ফাঁসিতে প্রাণ দিল কয়েক শত। মরণের ভয় যেন কোথাও নাই,—কেবলই দেখিতে পাই—"পড়ি গেল কাড়াকাড়ি, আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান তারি লাগি তাড়াতাড়ি।"

এইভাবে এক ভয়ানক অবস্থার ভিতর দিয়া বিপ্লবীরা ছুটিতেছিল। ভয়ানক অবস্থা বলিতেছি এই জন্য যে, পরাধীন দেশে বিপ্লবী জীবনে, বাহিরের সুখ-শান্তির আস্বাদ গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। নামগোত্রহীন এই সব লোকদের বাপ-মা ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন বলিয়া কেহ থাকে না ; বাড়ী থাকে না, ঘর থাকে না, নাম-যশোর আকাঙ্খা থাকে না,—"গৃহছাদ তব অনন্ত আকাশ, শয়ন তোমার সুবিস্তৃত ঘাস।" এই চৌহদ্দীর ভিতর ইহারা ঘুরিয়া বেড়ায়। একদিকে শত্রুপক্ষের খোঁজা-খুঁজি আর একদিকে মিত্ররূপে শত্রু স্বদেশবাসীর দল। কেবল লক্ষ্যের প্রতি অফুরন্ত ভালোবাসা আর সেই ভালোবাসা হইতে জাত আনন্দই থাকে তখন তাহাদের একমাত্র সঙ্গী। ফাঁসীর জীবন, জেলের জীবন, নির্বাসন-বনবাসের জীবন, সব কিছু হইতেই ভয়ঙ্কর এই অজ্ঞাতবাসের জীবন। কে কত সংযত, কে কত ধৈর্যশীল, সাধনায় সিদ্ধিলাভের কার ব্যাকুলতা কতখানি তাহার পরীক্ষা হইয়া যায়

এই সময়ে। এক কথায় কঠোর চরিত্রবলের মাপকাঠি এই অজ্ঞাতবাসের জীবন। স্বাধীন জাতির সৈন্যদলের দেশপ্রীতিও ইহাদের স্বদেশপ্রেমের কাছে হার মানিয়া গিয়াছে। যাহা হউক, এইভাবে চরিত্রবলের পরীক্ষা দিতে দিতে তাহারা যখন দিগ্‌বিজয়ী হইয়া উঠিতেছিল তখন তাহারা শক্তিমান ইংরেজকেও মুগ্ধ করিতে পারিয়াছিল। ইহার ফলস্বরূপ একদিকে দেখা দিল "মন্টেগু চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার" ; অপর দিকে সম্রাটের ঘোষণাবাণী। সে ঘোষণাবাণী রাজভক্ত ভারতবাসীর জন্য ছিল না ; ছিল তাহাদেরই উদ্দেশ্যে—যাহারা, দিনকতক আগেও রাজনীতিক দস্যু, নরহত্যাকারী বলিয়া সাধারণ্যে পরিচিত ছিল। দেশের লোকেরা একমুখে যাহাদের নিন্দা করিত আর একমুখে প্রশংসা করিয়া কুল পাইত না, দেশের খবরের কাগজওয়ালারা যাহাদিগকে "ডাকাত" "আততায়ী" ইত্যাদি আখ্যা দিয়া রাজভক্তির সঙ্গে সঙ্গে, সমাজের ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখিয়া আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ঐ ঘোষণাবাণী শুনিয়া কি করিলেন কে জানে ! যে মহারাণীর ঘোষণাবাণী লোকে জানিয়া না জানিয়া আজিও বলাবলি করে, যে ঘোষণাবাণীর কথা শুনিতে শুনিতে লোকে ঘুমাইয়া পড়ে, ঘুমাইতে ঘুমাইতে অমৃত সমান যে বাণী শুনিয়া কিছুতেই তৃপ্ত হয় না, সম্রাটের এই বাণী তাহাকেও পেছনে ফেলিয়া গিয়াছে। তেষট্টি বৎসর আগেকার সেই বাণী আর এই রাজকীয় বাণী একই বংশ গোত্র সম্ভূত, তবে স্থানকালভেদে বুড়োয় আর জোয়ানে যা প্রভেদ তাই মাত্র। আর কিছু নয়। এইভাবে পনের বৎসর কাটিয়া গেল।

বিপ্লব-শিশুর বয়স যখন বছর ষোল, তখন দেশের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল এক মস্ত বড় পরীক্ষা। উহা হইতেছে পরম শান্তিময় "অহিংস-অসহযোগে"র বাণী। যে দিন ঐ বিপ্লব-শিশুর জন্ম হইয়াছিল সে দিন সে অসহযোগের বাণী উচ্চারণ করিয়াই ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। কোনোরকম রফা করিবার কল্পনা যদি তাহার মাথায় থাকিত তবে সে তাহা অবশ্যই করিতে পারিত। তবু এই অসহযোগ অহিংসার আবরণে নিজেকে ঢাকিয়া দেখা দিল। এ যেন ঝুনা বুড়োর চাতুরী, পাকা

ব্যবসাদারের চালাকী মাত্র। সে পবিত্রতা নাই, সে দৃঢ়তা নাই, সেই বেপরোয়া ভাব নাই ; লক্ষ্যের জন্য সেই একাগ্র সাধনা নাই। আছে চাতুরী-চালাকী, কম খরচায় বেশী লাভের চেষ্টা, ব্রহ্মচারী না হইয়াও ব্রহ্মচর্য্যের ভাণ, হীন হইতে হীনতম হইয়াও মহোত্তম বস্তু লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। গত দিনে যাহারা চরম বিপ্লবী ছিল আজ তাহারাও ইহাতে মাতিয়া গেল! কেন? এটি সেই বিপ্লব-শিশুর খেলা। সত্যিকারের বন্ধু তার কে, সে না হইলে কাহাদের চলে না, ইহা সে জানিতে চাহিল ; সে এবার পরীক্ষার কষ্টিপাথরে মানুষ যাচাই করিয়া দেখিতে চাহিল। বুঝাইল, "দুঃখের পর দুঃখের ভিতর দিয়া তাহাদের বিজয় রথ অবাধ-গতিতে চলে ; পরিণামে জয়ী তাহারাই হয়, যাহারা আমাকে আঁকড়াইয়া থাকে। আমি অবনতকে উন্নত করি, দাসকে প্রভু করিতে পারি, বন্ধুর পথ সরল করি, যাহারা সব কিছু ত্যাগ করিতে পারে আমারই জন্য ; তাহাদিগকে দিগ্‌বিজয়ীর মুকুটে আমিই ভূষিত করিয়া থাকি।" কিন্তু তাহার সে কথা কেহ শুনিল না ; কেহ বুঝিল না। সমুদয় দেশ যেন এক রগড়ের মধ্যে ডুবিয়া গেল! চালাক লোকেরা স্বদেশসেবক সাজিবার এমন সুবর্ণ সুযোগ মুঠোর ভিতর পাইয়া যে যতো রকমে সম্ভব চালাকি করিল। চরিত্রবলকে ত্যাগ করিয়া লোকবলের দর্পে দর্পী সমাজ যেন নরক গুলজার করিয়া তুলিল! বিপ্লব-শিশুর কার্য্য শেষ হইল—যাইবার সময়ে সে যেন বলিয়া গেল, "যা সহজে ঘটে না তাহা আমি ঘটাইয়াছি, যাহা কেহ সহজে পায় না আমি তাহা দিয়াছি। মূঢ়, মূর্খ, থাক এখন এইভাবে ; আপন কর্মফল ভোগ কর। অপরিমিত যশের অধিকারী হওয়া তোদের সাজে না!"

যাহা হোক, অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হইল। দেশ যে গতিতে আগাইয়া চলিতে লাগিল তাহার পরিমাপ করা শক্ত। এই যুগের স্বদেশী গান আর চিত্র যেন কোনোরকমে ঠাট বজায় রাখিয়া চলিতে-ছিল। ভাবরাজ্যের যে দুই চড়ার উপর দুই পা দিয়া এই আন্দোলন দানব দাঁড়াইয়াছিল, উহার আকারটা যতো বিশাল ছিল, ততটা ভয়ঙ্কর ছিল না। যাহারা ইহাকে ঘিরিয়া নাচিতেছিল, তাহারা ইহার মূল্য

যতটা ধার্য্য করিয়াছিল, রাজনীতির বাজারে উহার দামটা যে আশানুরূপ হয় নাই, ইহা তাহারা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল। আর বুঝিতে পারিয়াছিল বলিয়াই ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িয়াছিল। দিন কতকের জন্য কীর্তনটা বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ভাবটা আর স্থায়ী হইল না। কারণ বিষয়বস্তুটা আগেকার সে প্রাণ নিংড়ানো ভালোবাসা দিয়া গড়িয়া উঠে নাই।

এই সময়ে এত ব্যাপকতা সত্বেও কোনো "মর্লিমিণ্টো শাসন-সংস্কার" দেখা দিল না কেন? তাহার কারণ এক নম্বর, "রাজার সঙ্গে আমাদের কোনো বিরোধ নাই, আমাদের বিরোধ আমলাতন্ত্রের সংগে" এই উপায়কে সঙ্গী করিয়াই '২১ সালের আন্দোলন যাত্রা সুরু করিয়াছিল। দুই নম্বর, যাহারা পূর্ববর্তী যুগে বৃটিশ রাজতন্ত্রকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহারাই যখন ইহার সঙ্গে মিশিয়া গেল, তখন ১৯০৭ সালের পুনরাভিনয় ঘটিবার কোন কারণ ছিল না। আর তিন নম্বর একটা নূতন শাসন-সংস্কার এই সবেমাত্র দেওয়া হইয়াছে। ইহার ফলাফল তখনও দেখা যায় নাই। চট্ করিয়া একটা কিছু ইংরেজ করে না। কীর্তনটা যখন থামিয়া গেল, তখন বহু লোক নানা কারণে সরিয়া পড়িল। এই আন্দোলনের ব্যাপকতা ছিল, কিন্তু গভীরতা ছিল না। বন্যার দৃশ্যটাই শুধু লোকে চোখে দেখিল। যদি তাহারা স্রোতের গতি দেখিতে পাইত, যদি তরঙ্গের খেলা দেখিয়া আনন্দ পাইত, যদি তরঙ্গে তরঙ্গে সংঘর্ষের সে দ্যুতি ইহারা দেখিতে পাইত, তাহা হইলে হয়তো ইহারা এত সহজে সরিয়া পড়িত না। মানুষের অন্তরে ষোল আনা ভীরুতাই থাকে না; সাহস-শৌর্য্য সে তো বুঝে, ভালো-বাসে; তবে কম আর বেশী। সকলেই যে মৃত্যু এড়াইবার জন্য এ দিকে ভিড়িয়াছিল তাহা বলা চলে না। অল্প বয়সে বেশী লাভের জন্যই অনেকে এই পথটা বাছিয়া লইয়াছিল। আমাদের জাতীয় চরিত্রের একটা মস্ত বড়ো দুর্বলতা এইটি। আমরা ধৈর্য্যের পরিচয় দিতে পারি না। তাহারা পরাধীনতার জ্বালায় এমন জ্বলিতেছিল যেন এক বৎসরের বেশী আর একটি দিনও সহ্য করিতে পারিতেছিল না।

এত অধৈর্য্য যে, মরিতে পারিলেই যেন সব কিছু হইয়া গেল। মরণটা লক্ষ্যের জন্য সার্থক হইবে কি না, তাহা ভাবিবার সময়ও ইহাদের থাকে না। বাঁচিয়া থাকার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ আর মরিবার জন্য অত্যন্ত অস্থিরতা এই দুইটি একই অবস্থার এপিঠ-ওপিঠ মাত্র। দুইই বড়ো রকমের দুর্বলতা ছাড়া আর কিছু নয়।

বোধ হয় '২২ সালে কংগ্রেসের ব্যর্থতা দেখার ফলেই ভারতের স্থানে স্থানে আবার বিপ্লবের ইচ্ছা উঁকি মারিতে লাগিল। এই ইচ্ছা ১৯৩০ সালে যাইয়া চরমে উঠিয়াছিল। '২১ সাল হইতে '৩০ সাল অবধি এই দশ বৎসর ভারতের ইতিহাসে এক বিচিত্র অধ্যায়, বলা যাইতে পারে। এই সময় চারি দল খেলোয়াড় ভারতের রাজনীতির ময়দানে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামিয়াছিল। নির্জলা কংগ্রেসী, প্রাচীন মতের নির্জলা বিপ্লবী, মিশ্রিত দল আর কমিউনিষ্ট। এ সব বাদে মুখাপেক্ষী এবং মুসলিম লীগ ইত্যাদি সম্প্রদায় বা ছোটখাট দু চারটা দলও ছিল। ১৯১৯ সালের শাসন-সংস্কারের প্রতিশ্রুতির কথাটা খুব বড়ো করিয়া ধরিলে "সাইমন কমিশনের"র আসার কথা ছিল অন্ততঃ '৩০ সালে! কিন্তু তা না হইয়া দুই বৎসর আগেই "সাইমন কমিশনে"র ব্যস্তত্রস্তভাবে এ দেশে হাজির হইবার কি কারণ ছিল! ইংরেজ যাহা করে, যাহা বুঝে তাহা আমাদের মতো করে না অথবা বুঝে না। তাহাই যদি হয় তবে এ বিষয়ে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। বিষয়টা জটিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু একটা সহজ কারণ এই ছিল যে, এইখানে ইংরেজ চাহিয়াছিল একেবারে এক ঢিলে দুইটি পাখী মারিতে। ইহাতে একদিকে যেমন ১৯১৯ সালের প্রতিশ্রুতিটা রক্ষা করা হইল আর একদিকে কংগ্রেসের উপলক্ষে জনসাধারণের চেতনাটাকে একেবারে নষ্ট করিয়া দিবারও একটা চমৎকার উপায় হইল। পরে এই "সাইমন কমিশন"ও এ বিষয়ে যথেষ্ট বিবেচিত না হওয়ায় ১৯৩১ সালে আবার একটা "রাউণ্ড টেব্‌ল্ কন্‌ফারেন্স" ডাকিবার প্রয়োজন হইয়াছিল।

সাইমন কমিশনের সম-সম কালেরতিনটি প্রধান ঘটনা ছিল—কমিউনিষ্ট আন্দোলনের মাথা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য মীরাট ষড়যন্ত্র

মামলার সৃষ্টি; কংগ্রেসের লবণ আন্দোলন; এবং চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুঠের আয়োজন। এইখানে আরও একটু আলোচনা করার দরকার আছে। দেবাসুর যুদ্ধের পরবর্তীকাল হইতে দেখা যায় যুগে-যুগে অশান্তির যুগের পর শান্তির যুগ দেখা দিয়াছে; আবার তাহার পাল্টা চলিয়াছে। '২১ সালের কংগ্রেসী আন্দোলন পরম শান্তিময় আন্দোলন। আধ্যাত্মিক পথের অতি নিম্নস্তরের সাধকদের মত নিম্নস্তরের কর্মীদের জন্যই যেন ইহার সৃষ্টি—রাজনীতিক ক্ষেত্রে ইহা যেন এক শিক্ষানবিশীর যুগ। প্রথম যুগটা যেন ছিল স্বার্থপর বাহিরের বিদেশী লোকের দ্বারা ভারতের স্বাধীনতা লাভের চেষ্টার যুগ। কাজেই সর্বতোভাবে—কায়েন মনসাবাচা—পরিত্যাজ্য। আর খাঁটি স্বদেশসেবা এবং স্বদেশসেবক দলের আবির্ভাব হইল এই সময়ে এই প্রথম! যদি এরূপ না হইত তাহা হইলে অস্ত্রের খেলা ব্যতীত ইহার চাল-চলন, জন্ম-বৃদ্ধি এবং পুষ্টি নিশ্চয় অন্যরূপে দেখা দিত।

যাহা হোক, আন্দোলনের স্রষ্টা নিজেকে সাধারণ লোকের মতো সাধারণ স্তরে নামাইয়া সাধারণের দুঃখে দুঃখী হইয়া যে আন্দোলন সৃষ্টি করিলেন, তাহার পাল্টা দিয়া আর এক দিক হইতে শান্তিময় কমিউনিষ্ট আন্দোলন দেখা দিক কেন? কংগ্রেস আন্দোলন দেশের লোকের হৃদয়ে শান্তি আনিবার পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত না হওয়ার জন্যই কি উহা দেখা দিয়াছিল? না, রুশিয়ার সাহায্যে ভারত স্বাধীন করিবার ইচ্ছা মনে জাগিয়াছিল; অথবা উহা বিশ্বপ্রেমের মদিরায় মাতোয়ারা হইয়া পড়ার ফল? কিম্বা এরূপ বাসনা মনে জাগিয়াছিল কি-না জানি না যে, ১৯১৪ সালে যেমন এ দেশের বিপ্লবীরা জার্মাণীর সাহায্যের আশায় ছিল, জার্মাণীর পরাজয়ের পর এই নূতন যুগে রুশিয়াই একমাত্র দেশ যে, ভারতবাসীর সেই অভাবমোচনে একমাত্র যোগ্য পাত্র! যাহা হউক, এ যুগের ভারতীয় রাজনীতির ময়দানে যেমন চারিটি রাজনীতিক মল্লের সন্ধান মিলিয়াছিল, তেমনি এ যুগকে "ডবল শান্তি"র যুগ বলিয়া বর্ণনা করিলে বোধ হয় অন্যায় করা হইবে না।

এইভাবে '৩৫ সালে "সাইমন কমিশন"-এর বদান্যতায় দেশ ধন্য

হইল। দেশময় নূতন নির্বাচনের ঢেউ উঠিল। '৩৭ সালে নির্বাচনে জয়ী বীরবৃন্দ দেশসেবার জন্য কাউন্‌সীলে আর এসেম্ব্লীতে ছুটিলেন। অর্থোপার্জনের সুযোগ আবার নূতনতরভাবে দেখা দিল। যে যেমন পারিল আপন শক্তি ও সাহস অনুযায়ী টাকা লইয়া তেমনি ছিনিমিনি খেলিতে লাগিল। পৃথিবীর উপর দিয়া আবার এত বড়ো একটা লড়াই চলিয়া গেল। সে লড়াইয়ে এ দেশও নিশ্চেষ্ট ছিল না। "অর্থহি পরমং তপঃ" জ্ঞান করিয়া যার যার ট্যাঁক ভরতি করিবার জন্য সবাই ব্যস্ত ছিল। এই যে অর্থোপার্জনের সুযোগ ইংরেজ দিয়াছিল সে কখন? —'৪২ সালের ফেব্রুয়ারীর পর হইতে। কেন? একটু খুলিয়া বলা ভালো। কংগ্রেস বলিয়াছিল ইংরেজের স্বার্থরক্ষায় ভারতের ধন ও লোক দিয়া সাহায্য করিবে না। বেশ ভালো কথা! এখন দেখা যাক, কংগ্রেস তাহার এই প্রতিশ্রুতি কতোখানি রাখিতে পারিয়াছিল!

এইখানে আমাদের একটু থামিতে হইবে। সেই সময়কার জটিলতর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কয়েকটা মূল্যবান তথ্য আমাদের বাদ দিলে চলিবে না। '৪১ সালে জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করিবার পর তাহার দুই শত বৎসর ভারত শাসনের ইতিহাসে সেই প্রথম জলে, স্থলে ও আকাশে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভাবী দুর্দিনের আশঙ্কা ইংরেজকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করিয়া তুলিল। ভারতবর্ষের জনমতটাও স্বপক্ষে রাখা এই প্রথম তাহার প্রয়োজন হইয়া পড়িল। প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্র-ধুরন্ধর চার্চিলের দৌত্য বহন করিয়া "ভারতবন্ধু" স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রীপ্‌স্‌ তাই এ দেশে শুভাগমন করিলেন '৪২ সালের ২২শে মার্চ তারিখে। শিকারের মাছটাকে বঁড়শিতে গাঁথিয়া লইয়া, তারপর সূতা ছাড়িয়া জলের ভিতর ইচ্ছামতো খেলাইতে ইংরেজ যে বরাবরই বেশ পোক্ত তাহার প্রমাণ বহুবারই আমরা পাইয়াছি। ভারতীয় শাসনতন্ত্রের সংস্কারের ধাপগুলি যে ইহারই এক একটি পরিচয় ছাড়া আর কিছু ছিল না, এ আলোচনাও আমরা আগে করিয়াছি। বস্তুতঃ ভারতের বিপ্লবী চেতনাটাকে তাহার স্থির লক্ষ্য হইতে দূরে লইয়া যাইবার উপায় হিসাবেই ইংরেজ এই

কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। এক-একটি শাসন-সংস্কারের ভিতর দিয়া দেশবাসীও এইভাবে ইংরেজ সরকারের চরম ও পরম বদান্যতার পরিচয় পাইয়া নিজেদের ধন্য মনে করিয়া আসিতেছিল। এই উদ্দেশ্যে ইংরেজের নিজের প্রয়োজনে ইংরেজ একদিন সৃষ্টি করিয়াছিল—'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস।' এ কথা আজ কাহাকেও নূতন করিয়া শুনাইতে হইবে না। পেট পুরিয়া খাইয়া, মোটর গাড়ী চড়িয়া, এসেম্ব্লী গৃহের বৈদ্যুত পাখার নীচে আরাম কেদারায় শুইয়া যদি দেশ-সেবা করা যায়, তবে কোন বেকুবে, বিপ্লবী-জীবনের কণ্টকাকীর্ণ পথ বাছিয়া লইবে? এই জন্যই বুদ্ধিমান স্বদেশসেবীগণ দলে দলে সেদিন ভিড় করিয়াছিলেন এসেম্ব্লীর দরজায়। কিন্তু বেকুব সব দেশেই থাকে। ভারতবর্ষেও আছে। তাই দেশসেবার এই সহজ পথটাও ইহাদের কাছে তত মনোরম মনে হয় নাই।

যাহাই হউক, ১৯৪২ সালের গোড়ার দিকে ক্রীপ্‌স্ যে প্রস্তাব ডাউনিং ষ্ট্রীট হইতে বহন করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহা ভারতীয় নেতাদের মনোরঞ্জন করিতে পারে নাই।

এই সময়ে ভারতবর্ষে কংগ্রেসের অবস্থাটাও একটু তলাইয়া বুঝা ভালো। কমিউনিষ্ট আন্দোলনটা তখন বেশ জোরালো হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা নূতন একটা কিছু বলিবার মতো পাইয়া গরম গরম বক্তৃতা দিয়া চাষী ও দরিদ্র জনসাধাণকে রাতারাতি হাত করিয়া ফেলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আবার এ দিকে '৩৭ সালের পর হইতে '৪২ সাল পর্য্যন্ত এই পাঁচটা বৎসর জোরালো একটা কিছু করিবার মতো কংগ্রেসসেবীগণ পায় নাই। সুতরাং এই ঘোরালো পরিস্থিতির মধ্যে ইংরেজের চরম দুর্গতির সুযোগেও একটা কিছু না করিলে জন-সাধারণের কাছে কংগ্রেসের সম্মান রক্ষা করিবার উপায় ছিল না। তা ছাড়া অসংযত কংগ্রেসকর্মীদের অলস মস্তিষ্কে করিবার মতো কিছু না থাকায় ঘোঁটমঙ্গল পাকাইয়া দলের ভিতর দল পাকাইতে তাহারা উৎসাহী হইয়া উঠিল। এই সব নানান দিক বিবেচনা করিয়াই ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে কংগ্রেসকে বাধ্য হইয়া "কুইট্ ইণ্ডিয়া" প্রস্তাব

গ্রহণ করিতে হয়। বৃটিশ গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের এই প্রথম বিপ্লবাত্মক ঘোষণা। আনাড়ি হাতের অকর্মণ্যতার পরিচয় দুই মাসের মধ্যেই প্রকাশ পাইল। এ দিকে বিনা খরচায় অল্প সময়ের মধ্যে বেশী লাভের সম্ভাবনা দেখিয়া বুদ্ধিমান কমিউনিষ্ট দল ইংরেজের আসরে ভিড়িয়া পড়িয়া কীর্তনটা আরও জমাইয়া তুলিল। খ্যাত-অখ্যাত প্রায় সমস্ত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দই কারারুদ্ধ হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলনেরও চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি ঘটিল।

'৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলন আজ অনেকের কাছেই একটা প্রকাণ্ড জিজ্ঞাসাস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। আগষ্ট আন্দোলন ব্যর্থ হইল কেন? তাঁহাদের এই প্রশ্নের উত্তরে আমার বক্তব্য হইতেছে—'৪২ সালের এই আন্দোলন একটা শৃঙ্খলাহীন অরাজকতা মাত্র। ইহাকে বিপ্লবের আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে না। বস্তুতঃ বিপ্লব কাহাকে বলে? বিপ্লবের কোনো অভিজ্ঞতা কংগ্রেসের কোনোদিন ছিল কি? জনসাধারণকে উত্তেজিত করিয়া ইতস্ততঃ দুই-একটা বিপ্লবীসুলভ অস্ত্রের খেলা দেখাইলেই কি বিপ্লব হয়? আসলে '৪২ সালের এই আন্দোলন সম্পর্কে কংগ্রেসের কোনো নির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতিই ছিল না। তাই এই সময়ে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ হইবার পর ভারতবর্ষে কংগ্রেসের কোনো অস্তিত্বও ছিল না বলিলে বোধ হয় খুব অন্যায় হইবে না। আর সবচেয়ে মজার কথা এই যে, কংগ্রেসের বাঘা বাঘা নেতৃবৃন্দ, হিংসাত্মক এই আন্দোলনকে কংগ্রেসের আন্দোলন বলিয়া পরে স্বীকারই করেন নাই; তাঁহারা বোধ হয় চাহিয়াছিলেন, "অহিংস বিপ্লব"! আর তাঁহাদের সেই অহিংস বিপ্লবের বাস্তব রূপটা অজ্ঞ জনসাধারণ ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই।

ইংরেজ গবর্ণমেন্ট কংগ্রেসের এই ব্যর্থতার সুযোগ লইতে ছাড়ে নাই। সুযোগটা সে পুরামাত্রায়ই নিয়াছিল আর ইহারই একটা পথ হিসাবে সে বাংলা দেশে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করে। খাইতে না পাইয়া ও অখাদ্য খাইয়া কয়েক লক্ষ লোক মরিয়া গেল। সংগতিপন্ন বুদ্ধিজীবী দেশবাসীরা অর্থোপার্জনের এই মহা সুযোগটাকে নির্বোধের মত বেহাত

না করিয়া যে যাহার ট্যাঁক ভরিতে মন দিল। দুর্ভিক্ষে যাহারা মরিল, তাহারা সঙ্গে সঙ্গেই জাগতিক সব চিন্তার হাত হইতে মুক্তি পাইয়া বাঁচিয়া গেল। আর যাহারা মরিতে মরিতেও খাইয়া না-খাইয়া, আধপেটা খাইয়া কোনোরকমে বাঁচিয়া গেল, সেই সব মস্তিষ্কজীবী মধ্যবিত্ত সমাজ ; খুঁজিয়া দেখিলে যাহাদের ভিতর অতীত স্বদেশসেবকের ভুরি উদাহরণ মিলিত ; তাহারা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিল ইংরেজের উপুড়করা থলিয়ার নীচ হইতে হরিলুঠের ভাগ কুড়াইতে। আপনি বাঁচিলে বাপের নাম ! ভারতীয় রাজনৈতিকদের স্বদেশসেবা আপাততঃ কিছু-দিনের মতো শিকায় তোলা রহিল। সুতরাং কংগ্রেসের পণ টিকে নাই। ইংরেজের স্বার্থরক্ষায় ভারতের ধন ও লোক দিয়া সাহায্য করিতে ভারতীয়েরাই আগাইয়া গিয়াছিল।

এখানে কংগ্রেস স্বম্বন্ধে এতোখানি আলোচনা করিতেছি, আর ভবিষ্যতেও করিতে হইবে ; তার কারণ ভারতের রাজনীতিক ময়দান হইতে বিপ্লববাদ প্রায় পুরাপুরি বিদায় নিয়াছিল ১৯৩০ সালের সম-সমকালে। '৩০ সালের পরবর্তী ভারতের ইতিহাস, মোটামুটি কংগ্রেসেরই ইতিহাস। আর এই ইতিহাস যদি একটু মনোযোগ দিয়া আমরা আলোচনা করি, তবে কতকগুলো মজার ব্যাপার আমাদের চোখে পড়িবে। উহাদের একটা হইতেছে এই যে, এই সময় হইতেই, "আন্তর্জাতিক" এই গালভরা কথাটা লইয়া কংগ্রেসের নেতারা খুব লাফালাফি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন ; অথচ, বাস্তব কর্মক্ষেত্রে তাঁহারা ইহাকে বেমালুম ছাঁটিয়া বাদ দিয়াছেন। "তোমার শত্রুর শত্রু, তোমার বন্ধু" আন্তর্জাতিক রাজ-নীতির এই অতি প্রাচীন সূত্রটি ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে নেতা বলিয়া যাঁহারা পরিচিত, তাঁহাদের কারও মগজে প্রবেশ করে নাই। স্বাধীনতা আন্দোলনে এই ধরণের আন্তর্জাতিক সাহায্যের কথা ইঁহারা চিন্তাও করিতে পারেন না। ইঁহাদের আন্ত-র্জাতিক ক্রিয়াকলাপের দৌড় চীন ও আবিসিনিয়ার দুঃখে দরদী হইয়া হাহাকার করা পর্যন্তই। যদিও ইহাদের সে সভা-সমিতি ও গালা-



বিনয়কুমার সরকার

গালিতে কেহই ভয় পায় নাই আর আবিসিনিয়া বা চীনও সেদিন রক্ষা পায় নাই।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, তবে কি ঐ ধরণের চিন্তা এ দেশে কেহই করে নাই? হাঁ, করিয়াছিল। আগেও একবার বলিয়াছি, করিয়াছিল উল্টামতের একদল যুবক যাহাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল, সামরিক শক্তিতে দেশটাকে স্বাধীন করিয়া নিজেদের জাতিটাকে দুনিয়ার অপরাপর জাতির সমকক্ষ করিয়া তোলা। ১৯৩০ সালের পরেও আবার এই চিন্তাকে কার্য্যকরী রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন আর একজন। তিনি হলেন নির্বাসিত বিপ্লবী রাসবিহারী বসু। আর '২১ সাল হইতে '৩৮ সাল অবধি রাজনীতিক্ষেত্রে কংগ্রেসের ব্যর্থতা দেখিয়াই বোধ হয়, ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যেও আর একজনের মাথায় বিপ্লবী সুলভ এই ইচ্ছাটা উকিঝুকি মারিতেছিল। তিনি—সুভাষচন্দ্র। তাই জন্মভূমি হইতে চিরনির্বাসন বরণ করিয়া লইয়া কয়েক সহস্র মাইলের ব্যবধানে বসিয়াও স্বদেশবাসীর মুক্তি চিন্তাই একমাত্র জপ-তপ করিয়া বৃদ্ধ রাসবিহারী যখন ইংরেজের সেই পরম বিপদের মুহূর্তে চরম এক আঘাত হানিবার প্রস্তুতি পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিবার আয়োজন করিতেছিলেন, তখন ঠিক সময়েই সুভাষচন্দ্র তাঁহার পাশে গিয়া হাজির হইয়া ছিলেন। এটা হল '৪২ সালের শেষ দিকের ঘটনা। ১৯৪৩-'৪৫ সালের রাসবিহারী-সুভাষী ফৌজের ভারত আক্রমণও সেই বিপ্লব-শিশুরই আর এক নূতন খেলা সন্দেহ নাই। বিশ বৎসর যাবৎ শান্তিবাদীদের অযোগ্যতার পরিচয়টা ভালরূপে প্রকাশ পাইবার পর সে তাহার সামর্থ্যের প্রমাণটা আবার একবার দেখাইয়া দিল।

এ দেশের বিপ্লবীরা ইংরেজের সম্ভ্রম উৎপাদন করিতে পারিয়াছিল; কারণ এই সব ঘরছাড়া, লক্ষ্মীছাড়ার দলকে ভয় করিয়া চলিত। অপর দিকে কংগ্রেসকে তাহার ভয় করিবার কিছুই ছিল না। ইংরেজ জানিত, উহাদের যত দৌড় "কনস্টিটিউশন"-এর আওতার ভিতরে। গোঁয়াড়-গোবিন্দ ঐ সব লক্ষ্মীছাড়ার মতো আরাকান হইতে আফগানিস্থান ও হিমাচল হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত দৌড়ঝাঁপ করা ও সেই সঙ্গে তাহার

নাকে দড়ি দিয়া পিছে পিছে টানিয়া বেড়ান ইহাদের কর্ম নয়। এই জন্যই '২১ সালের পরবর্তী কংগ্রেসের শান্তিময় আন্দোলনে ইংরেজ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছিল। নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দেশবাসীও স্বাধীনতা লাভের জন্য ইংরেজের মুখ চাহিয়া বসিয়া রহিল।

পাকা লোকের পাকা কাজ। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট কোনো কিছুরই অতিবৃদ্ধি দেখিলে পূর্বাহ্ণেই তাহার গোড়াটা কাটিয়া দিবার বন্দোবস্ত পাকা করিয়া রাখিত। নাবালক ভারতবাসীর ঝুনা অভিভাবক বাঘা বাঘা নেতৃবৃন্দের কেরামতির দৌড়টা ইংরেজের নিকট ধরা পড়িতে যেমন দেরী হয় নাই, তেমনি বিচক্ষণ কবিরাজের মতো ভারতবাসীর নাড়ীর গতিটা লক্ষ্য করিয়া অব্যর্থ এক ঔষধের বিধান দিতেও তাহাকে বেগ পাইতে হয় নাই। এই মহৌষধের নাম "কমিউনাল এ্যাওয়ার্ড"। বস্তুতঃ এই ব্যাপারে ইংরেজ একচালেই বাজীমাৎ করিয়াছিল। এক দিকে বিশাল এই ভারতীয় সমাজদেহের অন্তর্গত ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থের প্রতিই সে যে সমানভাবে দরদী, সকল শ্রেণীরই আত্মিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট যে সমানভাবে যত্নবান ইহা এ দেশবাসীকে বুঝাইবার জন্য যেমন আর প্রমাণের কোনো প্রয়োজন রহিল না, তেমনি আর একদিকে, নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলিরও মেরুদণ্ডটা ইহা দ্বারা পুরাপুরি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল। ইহার পর হইতে ভারতীয় শাসনতন্ত্রে মোটামুটি যে সম্প্রদায়গুলির নামোল্লেখ দেখা যায়, তাহারা হইতেছে—মুসলমান, শিখ ও অ-মুসলমান। মরণোন্মুখ হিন্দুসমাজের ঘাড়টা পাকাপাকিভাবে ভাঙ্গিয়া দিবার বন্দোবস্ত হইল। আইনের বলে সৃষ্টি করা হইল আর একটি নূতন জাতি—"সিডিউল্‌ড্ কাষ্টস্।" ইংরেজ যে খালি রাজ্য শাসনই করে না, বিরাট হিন্দু-সমাজের কোন্ অন্ধকার কোণে নিপীড়িত অসহায় মানবাত্মা অবহেলিত হইয়া পড়িয়া আছে, তাহাদের জন্যও তাহার প্রাণ যে কাঁদিয়া উঠে ইহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ পাইয়া এ দেশবাসী চমৎকৃত হইল। রাজনীতিক মল্লযুদ্ধের ময়দানে যুযুৎসুর যে প্যাঁচ ইংরেজ সেদিন কষিয়াছিল তাহা বুঝিয়া উঠিতে এদেশের নেতৃবৃন্দের বহুকাল লাগিয়াছিল।

'২০ সালের পরবর্তী যুগে এই 'কমিউনাল এ্যাওয়ার্ড-এ সবচেয়ে বেশী লাভবান হইয়াছিল মুসলমান সমাজ। মুসলমানের প্রতি ইংরেজের দরদের পরিমাণ সেদিন যতোখানি ছিল, কংগ্রেসের হিন্দু নেতাদের দরদ তার চেয়ে ছিল অনেক বেশী। সেদিন ইহাদের কাণ্ডকারখানা দেখিলে যে কোন অর্বাচীনও এই ধারণা করিত যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন এতদূর আগাইয়া আসিয়া বুঝি একমাত্র মুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নতির উপরই ঠেকিয়া গিয়াছে। রাতারাতি উহাদিগকে উন্নত করিতে না পারিলে আর উপায় নাই। সত্য সত্যই মুসলমান সমাজ নিজে তাহার জন্য যতোটা ভাবিয়াছে, তার চেয়ে বেশী ভাবিয়াছে হিন্দুরা। বুদ্ধিমান মুসলমান সমাজ এই সুযোগের সদ্ব্যবহার পুরাপুরি করিয়াছে। এ দেশে সতেজ, সক্রিয় যদি কেউ থাকে তো সে আজ মুসলমান, হিন্দুরা নয়। হিন্দুরা জানে ভাবরাজ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে। পলিটিক্‌স্ বুঝা এ দেশের হিন্দু নেতাদের কর্ম নয়। মুসলমান নেতারা বাস করে বাস্তব জগতে। পলিটিক্‌স্ তাহারা হজম করিয়া বসিয়াছে পুরামাত্রায়। এ কথা আজ এখানে বলিতে বসিতাম না; বলিবার কোনো ন্যায়সঙ্গত কারণও থাকিত না, যদি না আমাদের বিরাট এই সমাজদেহ আজ গলিত কুষ্ঠে পরিপূর্ণ না হইয়া জীবন্ত হইত; যদি আজ মুসলমান ভারতে বাস করিয়াও অভারতীয় না হইত। বাংলা দেশেও আজ মুসলমানেরা বাঙ্গালী বলিতে বাঙ্গালী হিন্দু-সমাজকেই আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দেয়। ভারতবাসী হইয়াও মুসলমান সমাজ আজ পিতৃভূমিরূপে কল্পনা করে আরবকে। ভারতবাসী হিন্দুর চেয়ে তাহার কাছে বেশী আপন আরবী মুসলমান। সমগ্র মুসলমান সমাজ আজ এক বিশ্বব্যাপ্ত অখণ্ড "প্যান-ইসলামিক ষ্টেট"-এর কল্পনায় মশগুল। আর ইহারই প্রাথমিক সোপান হিসাবে তাহার প্রয়োজন পাকিস্তানের। মুসলমান সমস্যা এ দেশে কোনোদিন কোনো সমস্যা ছিল না; কোনোদিন কোনো সমস্যা নয়। উহাকে সমস্যা করিয়া তুলিয়াছে কংগ্রেস ও উহার কর্মপদ্ধতি। ইংরেজ ইহার সুযোগ নিয়াছে এই মাত্র।

এ দেশের নেতৃবৃন্দ কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন কি কেন

বর্তমান বৎসরের ইলেকশনে (জানুয়ারী, ১৯৪৬) মুসলমান সমাজের পৌণে ষোল আনা লোকই সমর্থন করিয়াছে মুসলিম লীগ ও তাহার পাকিস্তানের দাবীকে ? আজিকার হিন্দু-সমাজ খোঁজ রাখে কি, অণু অণু করিয়া কি বিপুল শক্তি সঞ্চয় করিয়া চলিয়াছে এই মুসলমান সমাজ ? কি বিরাট উদাম ইহাদের ! কি প্রচণ্ড শক্তিতে হিন্দু-সমাজের বুকে চরম আঘাত হানিবার জন্য ইহারা দিনে দিনে প্রস্তুত হইয়া চলিয়াছে ! সেদিন দূরে নহে।

ভারতীয় রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে বিলাতী মিশনের তিন অভিনয় আমরা দেখিলাম। দেখিয়াছি, কেন ইহারা আসিয়াছিল আর কাহাদের জন্যই বা ইহাদের পাঠান হইয়াছিল। এইবার চতুর্থ অঙ্কে দেখিতেছি "ক্যাবিনেট মিশনে"র আবির্ভাব। কিন্তু তার আগে একটা বিষয় বুঝিবার আছে ; সেটা হইতেছে গত বৎসরের (২৫শে জুন, ১৯৪৫) বড়লাটের সিমলা বৈঠক। আমি ইহাকে রাজনীতিক কোনো গুরুত্ব দিতে সোজাসুজি নারাজ। কারণ, "ওয়াভেল প্ল্যান"টিকে বাস্তব দৃষ্টি-ভঙ্গী দিয়া বিচার করিলে চোখে পড়ে দুইটি রূপ। প্রথমতঃ এক হিসাবে ওয়াভেল প্রস্তাব '৪২ সালের ক্রীপ্‌স্‌ প্রস্তাবেরই উল্টা পীঠ মাত্র। আর দ্বিতীয়তঃ, উহাকে '৪৬ সালের এই মন্ত্রী-মিশনের ভূমিকা-স্বরূপ বলিলে বোধ হয় খুব বেশী ভুল করা হইবে না।

এইবার ১৯৪৬ সালে ক্যাবিনেট মিশনের আবির্ভাবের কারণটা সম্বন্ধে একটু ভাবিয়া দেখা যাক। আমরা দেখিয়াছি, কংগ্রেসের শান্তিময় আন্দোলনে ইংরেজের কোনো উদ্বেগের কারণ ছিল না। আর দৃশ্যতঃ ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রেও এই সময়ে এইরূপ শান্তিই বিরাজ করিতেছিল। তবুও এই সময়ে ক্যাবিনেট মিশন আসিল কেন ? ইহার দুটি কারণ ছিল। প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ ভারতের বাহির হইতে জাপানের খাইয়া রাসবিহারী-সুভাষী ফৌজ বৃটিশ সাম্রাজ্যের বদ্ধ দুয়ারে যে প্রচণ্ড আঘাত হানিয়াছিল, ইংরেজের ভয়ের কারণ ছিল সেখানেই। আর দ্বিতীয়তঃ, কংগ্রেসী আন্দোলনের নিস্ক্রিয়তা ও নিষ্ফলতা দেখিয়া

দেশের একদল যুবকের মাথায় বিপ্লববাদের পুরানো মতিগতি আবার নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিতেছিল।

ইংরেজ জানিত, ঘরের খাইয়া বনের মোষ তাড়াইবার জন্য এই ধরণের প্রতিক্রিয়াশীল যুবকের অভাব এ দেশে কখনও ঘটে নাই। '৪৫ সালের শেষের দিকে আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার অভিনয়ই ইহাদের ভিতর যে মাদকতা আনিয়া দিয়াছিল, উপযুক্ত খোরাক পাইলে উহা ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিত, সন্দেহ নাই। '৪৫ সালের ২২শে নভেম্বর ধর্মতলা গুলী দিবস ইহারই প্রমাণ দিয়াছিল। বর্তমান বৎসরের (১৯৪৬) জানুয়ারী মাসে বোম্বাই ও করাচীতে সশস্ত্র নৌ-বিদ্রোহও দিয়াছিল ইহার দ্বিতীয় প্রমাণ। বিপ্লববাদের পুরানো ধারা আধুনিকতার বর্মে সাজিয়া আবার ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছিল। ঠিক এই হিসাবে '৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনেরও একটা বিরাট নৈতিক মূল্য ছিল, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। আন্দোলনকারীরা '২১ সালের শান্তিময় পন্থা ছাড়িয়া কংগ্রেসী আদর্শের বিপরীত এবং বহুনিন্দিত বিপ্লবীদিগের বিপজ্জনক পথই বা কেন বাছিয়া নিয়াছিল, তাহাও ভাবিবার কথা সন্দেহ নাই।

এখন বোধ হয় আর বুঝাইয়া বলিবার আবশ্যকতা নাই, ক্যাবিনেট মিশনের আজিকার এই ভারত সফরের প্রয়োজনীয়তাটা কোথায় আর ইহার লক্ষ্যই বা কাহারা! আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, ভারতীয় রাজনীতির যুগে যুগে এই ধরণের ঘোষণাবাণীগুলো হয় যাহাদের লক্ষ্য করিয়া তাহাদের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধটা কতটুকু। এইগুলি হাত পাতিয়া লয় যাহারা, ইহার সুফলটা উত্তরাধিকারসূত্রে ভোগ করিবার বন্দোবস্ত পাকা করিয়া রাখে যাহারা, ইহাকে কেন্দ্র করিয়া অল্প মেহনতে দেশসেবার অধিকারটা পুরামাত্রায় যাহারা একচেটিয়া করিয়া লইতে চায়, ইহার মূল্য নির্ধারণ করিয়া থাকে তাহারাই। এ ক্ষেত্রেও যে তাহার ব্যতিক্রম হইবে, সে আশঙ্কা নাই। ক্যাবিনেট মিশনের এই দানপত্রটা তাই তাহাদের হৃদয়ে আজ পুলকের হিল্লোল তুলিয়াছে। জন্তুটা গাই, কি বলদ, লেজ তুলিয়া একবার দেখিয়া লইবার ধৈর্য্যটুকুও

ইহাদের নাই। দেখিবার চোখ যদি ইহাদের থাকিত, বিচার করিবার মতো ধৈর্য্য যদি ইহারা না হারাইত তবে ইহারা বুঝিতে পারিত, ভারত-সমস্যার মীমাংসার জন্য সাত সাগর পাড়ি দিয়া যে তিনজন ইংরেজ ভদ্রলোক আজ এ দেশে পদার্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদের ঘোষিত এ দানপত্রের সঙ্গে ১৮৫৮ সালের মহারাণীর ঘোষণাবাণী ও ১৯১১ সালের সম্রাটের ঘোষণাবাণীর প্রভেদটা কতটুকু!

এবার মিশন প্রদত্ত দানপত্রটা কি বস্তু তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব ও ১৯৪৬ সালে ক্যাবিনেট মিশনের প্রকারান্তরে ভারত-বিভাগের এই কল্পনা যে একই বংশ ও গোত্রসম্ভূত তাহাতে এখন অনেকের সন্দেহ থাকিলেও অদূর-ভবিষ্যতে থাকিবে না। ভারতে রাজনৈতিক হ, য, ব, র, ল-এর যে প্রকাণ্ড একটা আবর্ত ইংরেজ আজ পাকাইয়া তুলিয়াছে, তাহায় চাবি-কাঠিরূপে সে ব্যবহার করিতেছে, মুসলমান সমাজকে। তাই ক্যাবিনেট মিশন মুসলমান সমাজের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া আকুল হইয়া উঠিয়াছেন। যে তিনটি প্রধান দলকে এই দানপত্রে মানিয়া লওয়া হইয়াছে, উহারা হইতেছে,—মুসলমান, শিখ ও অ-মুসলমান। ভারতবর্ষের আদি ও একমাত্র সমস্যাই যেন মুসলমান! ভারতবর্ষের একমাত্র পরিচয়ই যেন মুসলমান সমাজের পরিচয়! মিশন বলিতেছেন যে, চিরস্থায়ী হিন্দু রাজত্বের যে আশঙ্কা মুসলমান সমাজ করে, তাহা সম্পূর্ণ সত্য সন্দেহ নাই। কারণ ইহাতে মুসলমানের নিজস্ব সংস্কৃতি, সভ্যতা ইত্যাদি বেমালুম লোপ হইয়া যাইবারই সম্ভাবনা রহিয়াছে। তাঁহারা এই দিক দিয়া পাকিস্তানের দাবী সমর্থন করিতেছেন। তবে বাস্তব ক্ষেত্রে আপাততঃ তাহা সম্ভব নহে। ইহার কারণস্বরূপ তাঁহারা দেখাইতেছেন যে, পাকিস্থান হইলে তাহার দুই টুকরার মধ্যে ব্যবধান থাকিবে প্রায় হাজারখানেক মাইলের। সুতরাং ভবিষ্যতে যদি কখনও যুদ্ধ-বিগ্রহ বাধে তবে তাহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতে হইবে হিন্দু-রাষ্ট্রের অনুগ্রহের উপর। আর তাহা ছাড়া বাংলা দেশের ভিতর কলিকাতা (সমগ্র জনসংখ্যার যেখানে শতকরা ২৩ জন মাত্র মুসলমান) শহরটাই

যদি তাহাদের হাতের বাহিরে চলিয়া যায় তবে আর তাহাদের রহিল কি? ইহার পরই আর একটা প্রকাণ্ড সমস্যা হিসাবে তাঁহারা খাড়া করিয়াছেন দেশীয় নৃপতিগণকে। তাই সব দিক বাঁচাইয়া তাঁহারা প্রস্তাব করিয়াছেন যে, এক সম্মিলিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হউক। তাহাতে হর্তাকর্তা হইবেন সকল প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য হইতে প্রেরিত প্রতিনিধিবর্গ। আর এই প্রতিনিধিবর্গ নির্বাচিত হইবেন, প্রত্যেক প্রদেশ হইতে মুসলমান, শিখ ও অ-মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার অনুপাতে। প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলির হাতে কেবলমাত্র বৈদেশিক সম্বন্ধ, আত্মরক্ষা ও যান-বাহন-এর কর্তৃত্বটা বাদে আর সকল প্রকার ক্ষমতাই থাকিবে। আর সবচেয়ে বড়ো কথা, প্রদেশ ও রাজ্যগুলি সুবিধা ও ইচ্ছানুযায়ী আপনাদের ভিন্ন গোষ্ঠী বা মণ্ডল গঠন করিতে পারিবে এবং কেন্দ্রে নিজ মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত প্রদেশগুলির সুবিধা মতো সাধারণ দাবী উত্থাপন করিবার ক্ষমতাও ইহাদের থাকিবে। ইহার পর অভাবটা আর রহিল কোথায়? এক রাষ্ট্রের ভিতর থাকিয়াও পাকিস্থানের সকল সুবিধা পাইবার পরও আর কোনো অভাব সত্যই রহিল কি-না, সে বিচার আজ মুসলমান সমাজই করিবে, অপর কেহ নহে।

এখন ভাবিয়া দেখা দরকার ইংরেজের দিক হইতে ইহাতে লাভটা কতোখানি, ক্ষতির পরিমাণটাই বা কতটুকু। ইংরেজ যাহা বুঝে আমাদের মতো বুঝে না; যাহা করে আমাদের মতো করে না। সে জানে তাহার প্রয়োজনটা কি আর তার পথটাই বা কোথায়? সে জানে আজি যাহা সমস্যা, কাল তাহার সমাধানের জন্য কেহ ব্যস্ত হইবে না। আজিকার প্রয়োজন কাল প্রয়োজনীয় নাও হইতে পারে। মন তাহার সংস্কারাচ্ছন্ন নহে। সে মোহশূন্যভাবে সমস্ত জিনিষ বিচার করে, বুঝে, সমাধান করে। ইংরেজ জানে আগামীকাল হয়তো ডাণ্ডা হাতে করিয়া, গোলাবারুদ খরচ করিয়া ভারতবর্ষের খানিকটা মাটী দখল করিয়া রাখার কোনো প্রয়োজন তাহার থাকিবে না। ভারতবর্ষের বাজারটা কায়েমী মৌরসীপাট্টা করিয়া দখল করিবার পাকাপাকি

প্রয়োজনটাই তাই আজ তাহার কাছে সকলের বড়ো প্রয়োজন হইয়া দেখা দিয়াছে। তাই সে আজ ভারতবর্ষকে তাহার দৈহিক গোলামী হইতে মুক্তি দিয়া নূতন করিয়া অর্থনৈতিক দাসত্বের পাকাকাকি দাসখৎ লিখাইয়া লইতে চায়। আর যতোদিন এ দেশের এই একদল স্বার্থলোভী পিশাচ আপনাদের মধ্যে কামড়া-কামড়ি করিয়া নরকটা গুলজার করিয়া তুলিতে থাকিবে এবং বিপ্লবপূর্ব মহাচীনের আর একটা দৃষ্টান্ত খাড়া করিয়া তুলিতে পারিয়া গর্ব অনুভব করিবে, ততদিন তাহার একাধিকারের প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ থাকিবে না। তাহার পক্ষে প্রয়োজন শুরু সময় মতো ইন্ধনটা যুগাইয়া দেওয়া মাত্র।

ভাবিলে দুঃখ হয়, অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস! আমার দেশ, আমার সমস্যা, ইহার সমাধান আমি করিব না, করিবে আর একজন; যাহার সহিত ইহার নাই রক্তের সম্বন্ধ; নাই মাটির সম্বন্ধ; না আছে সংস্কৃতির যোগাযোগ; না আছে নাড়ীর কোনো টান। আর এ সমস্যা সমাধানের ভার তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া সকল চিন্তার দায় যাহারা এড়াইয়াছে, তাহারাও আমারই দেশবাসী। আজ ভাবিতেছি যে, কালে বাঁচিয়া থাকার জন্য একটা বিশাল রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা নিজ নিজভাবে আর সকলেই বোধ করিতেছে, সেকালে আমাদের মনে কেন সে চিন্তা জাগিল না? কেন আমাদের ভিতর প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের, সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যের এবং ক্ষুদ্র জেলাপ্রীতির তীব্র বিষ ধীরে ধীরে প্রবল হইয়া উঠিল? কেন আমাদের দেশে চিন্তায়, কর্মে, চরিত্রে কোনো মাৎসিনি, কাভুর, লেনিন্ অথবা গারফিল্ড এর জন্ম হইল না? কেন আমাদের নেতাদের কাছে প্রতি দেশবাসীকে প্রতি রক্তবিন্দুর মতো মনে হইল না? রাষ্ট্র-গঠনের কৌশল কেন এ দেশের নেতাদের ভিতর দেখা দিল না? কেন আমরা একটা বিরাট আকাঙ্ক্ষার স্বাদ পাইলাম না? আমরা জাগিয়াছি তো ঘুমঘোরে অচেতন রহিলাম কেন? আমরা বাঁচিতে চাই তো চালাকি করিয়া কেন?*

---

* এই প্রবন্ধের রচনাকাল মে, ১৯৪৬ খৃঃ



বিনোদবিহারী চক্রবর্তী

ডাঃ কেশব বনিরাম হেড়গেওয়ার

ভারতের বিপ্লববাদের ইতিহাস মানেই প্রাক-স্বাধীনতা যুগে অনুশীলন সমিতিরই ইতিহাস একথা বললে একটুও ভুল বলা হয় না। অনুশীলন সমিতির বিস্তার ও প্রভাব এত ব্যাপক হয়েছিল, সমিতির সভ্যগণের চরিত্রবত্তা ও আত্মত্যাগের আদর্শ এত জ্বলন্ত ও উজ্জ্বল ছিল যে ভারতের অতি প্রত্যন্ত প্রদেশের গ্রামে গঞ্জের বালক বালিকারাও এই আদর্শকেই দেশপ্রেমের চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করেছিল। এই প্রসঙ্গে সুদূর মহারাষ্ট্রের এক বালকের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

১৮৮৯ খৃঃ নাগপুরে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম কেশব বনিরাম হেড়গেওয়ার-এর। শৈশবেই মাতাপিতাকে হারান। আট বছর বয়সে রাণী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসন আরোহণের হীরক জয়ন্তী উপলক্ষে স্কুলে বিতরণ করা মিষ্টির প্যাকেট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অশ্রুসজল চোখে বালক বলেছিল,—ও কি আমাদের রাণী ? পরবর্তীকালে স্কুল ইনস্পেকটরকে বন্দেমাতরম বলে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে হাইস্কুল থেকে কেশবকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। ইয়ংমলের জাতীয় বিদ্যালয় থেকে পরে কেশব ম্যাট্রিক পাস করে বিপ্লবের পীঠস্থান বাংলায় যাওয়ার স্বপ্ন নিয়ে কলকাতায় এসে ন্যাশানাল মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলেন। উদ্দেশ্য বাংলার বিপ্লবীদের সংগে যোগাযোগ স্থাপন করে মহারাষ্ট্রে বিপ্লবী আন্দোলন ছড়ানো।

অনুশীলন সমিতিতে যোগ দিয়ে অবিলম্বেই ভিতরের গোষ্ঠীতে প্রবেশের অধিকার পেলেন তিনি। ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, পুলিন দাস, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী প্রভৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হলেন কেশব। দামোদরের বিধ্বংসী বন্যায় রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে সমিতির অন্যান্য সভ্যদের নিয়ে ত্রাণকাজে যোগ দিয়ে সমাজ সেবার অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করলেন তিনি। ১৯১৬ সালে ডাক্তারী পাশ করে নাগপুরে ফিরে গিয়ে তিলকের নেতৃত্বে

কংগ্রেসের কাজে যোগ দেন ও ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতার জন্যে কারাদণ্ড হয় তাঁর।

এই সময়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে খিলাফৎকে জড়ানো নিয়ে গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর তীব্র মতবিরোধ হল। তাঁর প্রশ্ন হল,—ভারতের জাতীয়তা বলতে কি বোঝায়? আমাদের জাতীয় চরিত্রে শৃঙ্খলা ও সংহতির বোধ কোথায়! দেশ কেন পরাধীন হল? স্বাধীনতা লাভের পর দেশ গড়তে হলে যে গঠনমূলক কর্মসূচীর প্রয়োজন কংগ্রেস নেতাদের মাথায় তা নেই কেন? এইসব চিন্তা নিয়েই ১৯২৫ সালের বিজয়া দশমীর দিন নাগপুরে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন—রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের।

এর পরের ইতিহাস তাঁর এক তপস্যার ইতিহাস। ১৯৩৪ সালে ওয়ার্ধাতে সঙ্ঘের শিবির পরিদর্শন করতে এসে গান্ধীজি যখন দেখলেন ব্রাহ্মণ শূদ্র হরিজন সব এক পংক্তিতে বসে আহার করছে তখন কেশবকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, "আপনি আপনার সংঘকে নিয়ে কংগ্রেসে যোগ দিন।" ডাক্তার কেশব হেগগেওয়ার উত্তর দিলেন—"এরা সব তৈরী হচ্ছে আগামী দিনে দেশ নির্মাণ করবে বলে। কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক হয়ে শতরঞ্জি পাতার জন্যে নয়। ম্যান মেকিং ইজ মাই মিশন।" ১৯৪০ সালের ২১শে জুন ডাক্তার কেশব বলিরাম হেগগেওয়ার পরলোক গমন করেন।

শেষের কথা

জগতের অন্যান্য স্বাধীন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হবে যে বাংলার বিপ্লব যেরকম বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে, নানা বাধাবিঘ্নের সম্মুখে, পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অসাধারণ কৃতিত্ব, দক্ষতা ও সফলতার সঙ্গে পরিচালিত হয়েছিল অন্যত্র তার তুলনা নেই। বাঙালীর অপূর্ব প্রতিভা হৃদয়ঙ্গম করেই মহামতি গোখলে একদা বলেছিলেন "What Bengal thinks to-day, India thinks to-morrow." ১৯০৬ সালে লোকমান্য তিলক বলেন, বাঙ্গালী যে খেলা খেলবে তাতে জগৎ স্তম্ভিত হবে। বস্তুতঃ বাংলার যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে তার মধ্যে Revolutionary genius অন্যতম। বিপ্লববাদেই বাংলার অসামান্য প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ। এইক্ষেত্রে বাংলা যা সাধন করেছে তা অনতিক্রম্য রয়ে গেছে।

ইংরেজ রাজপুরুষেরা বিপ্লবীদেরকে "সন্ত্রাসবাদী" আখ্যা দিলেন। সমিতির বহু সভ্য রাজরোষে পতিত হয়ে অশেষ নির্যাতন ভোগ করেছেন, সর্বস্ব হারিয়েছেন, কারাগারে বন্দী বা অন্তরীণ, এমন কি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। তাঁদের অতুলনীয় স্বার্থত্যাগ ও নিষ্কাম আত্মদান জাতীয় জীবনে নূতন উদ্দীপনা নিয়ে এসেছিল।

১৯১৭ সালে ভারতের বিপ্লবের কারণ, প্রসার, প্রভাব, কর্মপদ্ধতি, উৎস প্রভৃতি অনুসন্ধান ও নির্ণয়ের জন্যে গভর্ণমেণ্ট এক কমিটি গঠন করলেন। বিলাতের জজ Mr. Justice Rowlatt-এর নাম অনুসারে কমিটিটির নাম Rowlatt কমিটি হয়। কমিটির উপর বিপ্লব দমনের প্রকৃষ্ট উপায় নির্ধারণের ভার দেওয়া হল। তাঁরা যে বিবরণ দিলেন তাকে সংক্ষেপে (Terrorist movement) Sedition Report বলা হত। বললে অত্যুক্তি হবে না যে এই Report-খানি অনুশীলন সমিতিরই ধারাবাহিক ইতিহাস মাত্র। বিপ্লবের সমস্ত ঘটনাবলী

ঐতিহাসিক নিষ্ঠার সঙ্গে এতে স্থান পেয়েছিল। কিন্তু সেই Rowlatt Report প্রকাশিত হওয়াতে এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল। বাংলার যুবক সম্প্রদায় এর থেকেই বিপ্লবের নূতন প্রেরণা লাভ করল ও ত্রুটি-বিচ্যুতির ইঙ্গিত পেয়ে তা সংশোধন করে নূতন উদ্যমে বিপ্লবের কাজে আত্মনিয়োগ করল। এর ফলে হিতে বিপরীত হল। অবশেষে এই কুফল (বা সুফল ?) লক্ষ্য করে গভর্ণমেণ্ট রিপোর্টটির প্রকাশ বন্ধ করলেন। সমস্ত কপি বাজেয়াপ্ত করলেন। অর্থাৎ নিজের বই নিজেই Proscribe করলেন। কিমাশ্চর্যম্ অতঃপরম্ !

অনুশীলন সমিতির ওপর শাসক সম্প্রদায়ের রোষদৃষ্টি পড়ল। ১৯০৮ সালে তাঁরা সমিতিকে বে-আইনী ঘোষণা করলেন। ফলে তখনকার মত সমিতি বাহ্যত বন্ধ হল বটে কিন্তু নানা স্থানে ছদ্মবেশে বহু বৎসর যাবৎ সমিতির কার্যকলাপ অব্যাহতই ছিল।*

সাম্রাজ্যবাদী শাসক হিসেবে ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষে দু'শ বছর ধরে যে সম্পদ লুণ্ঠন ও শোষণের অবাধ রাজত্ব চালিয়েছিল একথা সত্যি

---

* প্রথমত অতুলকৃষ্ণ ঘোষ তাঁর ভ্রাতা অমরকৃষ্ণের সহায়তায় ২নং ছিদাম মুদি লেন, দর্জিপাড়া ও পরে ৮নং হরি ঘোষ ষ্ট্রীটে এক সেবা সমিতির ছদ্মবেশে এটি পরিচালনা করেন। অতুলকৃষ্ণের আত্মগোপন ও অমরকৃষ্ণ গ্রেপ্তার হবার পর লেখকের সিমলাস্থিত ২২/১/১ জেলিয়াটোলাস্থিত (অধুনা সুধীর চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট) পৈতৃক বসতবাটীতে ৩/৪ বৎসর যাবৎ সমিতির উক্ত কেন্দ্রটি কোন নাম বিনাই পরিচালিত হয়েছে। এইখানে সন্ধ্যার অন্ধকারে অধিকাংশ নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীরই যাতায়াত ছিল। ভূপতি মজুমদার ও অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় (পরবর্তীকালে মন্ত্রী) এখানে নিয়মিত আসতেন। সভ্যদের Code নম্বর ছিল। ১৯১৬ সালে লেখক ধরা পড়বার পর এটি বন্ধ হয়ে যায়।

শেষ পর্যন্ত দর্জিপাড়া শাখা অমরেশ স্পোর্টিং ক্লাব নাম গ্রহণ করে এই দীপবর্তিকা জ্বালিয়ে রেখেছিল। স্বাধীনতা লাভের পর এই ছদ্মনাম ত্যাগ করে পুনরায় দর্জিপাড়া অনুশীলন সমিতি নামে আত্মপ্রকাশ করে। অধুনা এটি শুধু অনুশীলন সমিতি নাম ধারণ করেছে। এটি একটি যথারীতি রেজেষ্ট্রী-কৃত সংস্থা এবং এদের নিজস্ব ক্রীড়াঙ্গন ১৩নং ঈশ্বর ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৬-এ প্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচালিত। এই কৃতিত্বের মূলে স্মরণীয় সমিতির অন্যতম সভ্য কালাচাঁদ বসাক ও নিঃস্বার্থ কর্মীবৃন্দ।

হলেও ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অনেক সুফলের জন্যেও ধন্যবাদের পাত্র তারাই একথাও অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর বিবদমান কতকগুলি রাজ্যকে এক ভৌগলিক সীমায় বেঁধে একটি সুগঠিত সুশাসিত সুশৃঙ্খল সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদায় ইংরেজরাই পৌছে দিয়েছিল। এদেশে শাসনকারী ও বসবাসকারী ইংরেজদের মধ্যে লোভী দুর্নীতিপরায়ণ হিংস্র ও অসৎ মানুষ যেমন ছিল তেমনি সৎ, নিষ্ঠাবান পরোপকারী মনে প্রাণে মানবতার প্রতীক মানুষের সংখ্যাও একেবারে নগণ্য ছিল না। এমনি একজন মানুষই ছিলেন সার ডানিয়েল হ্যামিল্টন।

বাংলাদেশের এই নবজাগরণের সময় মনেপ্রাণে বাংলার হিতকামী ইংরেজ সার ড্যানিয়েল হ্যামিলটন (Sir Daniel Hamilton) সুন্দরবন অঞ্চলে কৃষিকার্য কিরকম লাভজনক হতে পারে তা প্রমাণ করে বাঙ্গালী যুবকদের চাকরীর পরিবর্তে একেই জীবিকা উপার্জনের প্রধান উপায় বলে পরামর্শ দেন। তদানীন্তন হাইকোর্টের বিচারপতি পরলোকগত সারদাচরণ মিত্র মশাইও তাঁর হরিপালস্থিত জমিচাষের স্বীয় অভিজ্ঞতা হতে একথার সমর্থন করেন। সেই সময় গবর্ণমেণ্ট Co-operative Societies Act বা সমবায় আইন প্রণয়ণ করেন। তারই সুযোগ নিয়ে ও হ্যামিল্টন সাহেবের আন্তরিক সহায়তায় সারদা-চরণ মিত্র ১৯০৯ সালে Bengal Youngmen's Zamindary Co-operative Society Ltd. প্রতিষ্ঠা করেন। এটাই বাংলায় দ্বিতীয় সমবায় সমিতি। এই সমবায় সমিতি মুখ্যতঃ অনুশীলন সমিতির সভ্যদের নিয়েই গঠিত ছিল। সতীশচন্দ্র এটির গঠনে ও সাফল্যের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং শেষ দিন পর্যন্ত কাজকর্ম পরিচালনায় সহায়তা করেন। ড্যানিয়েল সাহেবের উদ্দেশ্য ছিল তাঁর জন্মভূমি Scotland-এর আদর্শ অনুকরণে বাংলায় সমিতি গঠন করা। তিনি বাঙ্গালী যুবকদের চাকুরি মাত্র ভরসা করতে নিষেধ করতেন। পরমুখা-

পেক্ষী না হয়ে স্বাবলম্বী হতে উপদেশ দিতেন। তাঁর বদান্যতার বিষয়ে এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে এই কাজে সফলতার জন্যে তিনি এক কোটি টাকা দান করতে চেয়েছিলেন। অপর দিকে অনুশীলন সমিতির সভ্যদের যোগ্যতার প্রমাণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে ড্যানিয়েল সাহেব এই প্রতিষ্ঠান গঠনের সম্পূর্ণ ভার এই সমিতির ওপরেই ন্যস্ত করেছিলেন। বাংলাদেশের অন্য কোন প্রতিষ্ঠানকেই এই কাজের উপযুক্ত বিবেচনা করেন নি। উক্ত এক কোটি টাকাও এই সমিতির হাতেই অর্পণ করতে চেয়েছিলেন। বাঙ্গালীর অন্ন সমস্যার এটাই প্রকৃষ্ট উপায় বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল।

অনুশীলন সমিতি বে-আইনী ঘোষিত হবার পর এই সোসাইটি সভ্যদের একটি প্রকৃষ্ট মিলন ক্ষেত্রের অবকাশ দিয়েছে। এই Camouflage অযথা সন্দেহ নিরাকরণের সহায়তাই করেছিল।*

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করলে সভ্যদের আনন্দের পরিসীমা ছিল না। স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হল, সাধনা সিদ্ধি লাভ করল—তাতে কি উল্লাস। বহু বৎসর অজ্ঞাতবাসের পর সকলের প্রাণাধিক প্রিয় অনুশীলন সমিতি পুনর্জীবিত হল এতেই পরম তৃপ্তি ও সন্তোষ। সমিতির পুরাতন সভ্যেরা মিলিত হতে লাগলেন এবং এর ইতিহাস ও কাহিনী আলোচনা করে ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি স্থির করতে লাগলেন।

অনুশীলন সমিতির সভ্য যুবকবৃন্দ নানা পরিস্থিতির মধ্যে যে

* সমিতির জনৈক প্রবীণ সভ্য ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র বহু বৎসর যাবৎ নিঃস্বার্থ-ভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করে উক্ত Bengal Youngmen's Zamindary Co-operative Urban Society Ltd. প্রতিষ্ঠানের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে-ছিলেন। হুগলীর সন্নিকটে ব্যাণ্ডেল, নদীয়া জেলার রাণাঘাটে, সুন্দরবনে গোসাবায় প্রচুর পরিমাণ কৃষিজমি ও অন্যান্য সম্পত্তি অর্জন করেছিলেন। চাষ-আবাদ করে যা লাভ হত তা অংশীদারগণকে বণ্টন করা হত (Dividends to share-holders) কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে পরবর্তী কালে নেতৃবৃন্দের অনুপস্থিতিতে কয়েকজন দুষ্কৃতকারীর চক্রান্তে এটি বিনষ্ট হয়। এইভাবে স্বদেশী যুগের এক অনুপম কীর্তি লুপ্ত হয়ে গেল।

সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা লাভ করত তা দুর্লভ। নিয়মানুবর্তিতা, কর্মকুশলতা, দায়িত্বজ্ঞান, স্বাবলম্বন, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বিপদবরণ, নির্ভিকতা, উদারতা, দৃঢ়পণ, বিচক্ষণতা, মহানুভবতা, ত্যাগ, নিষ্ঠা, মানবসেবা, নিঃস্বার্থ পরোপকার, নিষ্কাম কর্মে প্রবৃত্তি, দেশাত্মবোধ, সঙ্ঘ সংগঠন ও পরিচালনশক্তি প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী সব সভ্যই নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে নিয়োগ করে কৃতী ও যশস্বী হয়েছেন। সুমহান উদ্দেশ্য সম্মুখে না থাকলে বা সুকঠিন কর্মে লিপ্ত না হলে প্রতিভার উন্মেষ হয় না। সমিতির মধ্যে অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন যে সব সভ্য ছিলেন তাঁদেরই কার্যকলাপে এর পরিচয় পাওয়া যায়। এই অনুশীলনী শিক্ষার সার্থকতা অবিসম্বাদী। সমিতির দু-চারজন সভ্য সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। স্বামী বলদেবানন্দ (নিতাই দাস)—দেরাদুন কিষণপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের তত্ত্বাবধায়ক। নেপাল ব্রহ্মচারী যুক্ত প্রদেশে জনশিক্ষার উদ্দেশ্যে অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

অনুশীলন সমিতির সভ্যদের চারিত্রিক উৎকর্ষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁদের বিমল নৈতিক চরিত্র আদর্শ স্থানীয়। ভদ্রতা ও শালীনতা অনুকরণীয়। তাঁরা সকল ক্ষেত্রেই সংযত ব্যবহার করতেন। কি স্বগৃহে, কি বিদ্যালয়ে, কি পথিমধ্যে, কি কর্মস্থলে, কি অন্য কোন স্থানে কোনরকম অশিষ্ট আচরণ করতেন না। বিশেষতঃ সভা-সমিতি বা সাধারণ স্থানে কোনপ্রকার উচ্ছৃঙ্খলার প্রশ্রয় দিতেন না। সকলকেই স্নেহ করতেন। ভালবাসা দ্বারা হৃদয় জয় করতেন। কাকেও হেয় জ্ঞান বা ঘৃণা করতেন না। তাঁরা স্ত্রীজাতিকে মাতৃবৎ জ্ঞান করতেন। যথোপযুক্ত মর্যাদা দিতেন। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে সর্বদা সংযত ব্যবহার করতেন। বয়োবৃদ্ধকে ও গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন।

সভ্যরা বিশেষ পরোপকারী ছিলেন। বিপন্নদের সকল প্রকারে সাহায্য করতেন। নিম্নবিত্ত বা দুঃস্থ মধ্যবিত্ত পরিবারদের সাহায্যের জন্যে প্রতি রবিবার গৃহস্থদের নিকট হতে মুষ্টিভিক্ষায় চাল সংগ্রহ হত। সভ্যদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে তাঁর সেবা করবার বন্দোবস্ত হত। সেকালে কোনরকম সৎকার সমিতির অস্তিত্ব ছিল না। সমিতির

সভ্যেরা সংবাদ পাওয়ামাত্র দ্বিধাহীন চিত্তে অসহায় মৃতের সৎকার করতেন। বস্তুতঃ মৃতের সৎকার যেন দৈনন্দিন ব্যাপার ছিল। এক কথায় বলতে গেলে সভ্যদের আদর্শ ছিল **Love all, hate none.** যৌবন উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে যুবকদের চরিত্র গঠন করে তাদের উদ্দাম শক্তি সৎকর্মে নিয়োজিত করবার উদ্দেশ্যে নানা দেশে নানা কালে নানা উপায় অবলম্বিত হয়ে থাকে। তার মধ্যে কতকগুলি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখযোগ্য যথা—**Y. M. C. A. (Youngmen's Christian Association), Boy Scouts.** ইত্যাদি। এদের অনুকরণে আমাদের দেশেও ব্রতচারী সঙ্ঘ, অজস্র সেবা সমিতি প্রভৃতি পরিচালিত হয়ে থাকে। কিন্তু তাদের আদর্শ, গঠন-প্রণালী ও কার্য্যবলীর সঙ্গে তুলনা করলে অনুশীলন সমিতির শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি হবে। কারণ এই সমিতিতে যুবকদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও প্রকৃত মনুষ্যত্বলাভের প্রয়াস হয়েছিল। সর্বোপরি একমাত্র এই সমিতিতেই গীতার মহৎ শিক্ষা সমুদয় অতিশয় নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসৃত হত। বিশেষতঃ গীতার "নিষ্কাম কর্ম" ধ্যান ও ধারণার বস্তু হয়ে উঠেছিল। "ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি" কর্মপ্রেরণা দিয়াছিল। কোন আশা আকাঙ্ক্ষা নেই কেবল "মন্ত্রের সাধন, কিম্বা শরীর পাতন।" এই জন্যেই অনুশীলন সমিতির সফলতা বিস্ময়কর।

অনুশীলন সমিতি মনুষ্যত্বলাভের যে উচ্চ আদর্শ স্থাপনা করেছিল সকল যুগেই তার আবশ্যকতা আছে। জন্মভূমি শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে গেছে বলে যে এইরূপ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে গেছে তা নয়। স্বাধীন ভারতের যোগ্য নাগরিক তৈরী করবার জন্যেও এর উপযোগিতা সর্বদাই বিদ্যমান। শিক্ষাবিস্তার, স্বাস্থ্যোন্নতি, শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার, দুর্নীতি দমন প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে দেশের ও দশের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। তবেই জাতির মঙ্গল। পরাধীন অবস্থায় অনুশীলন সমিতির উপযোগিতা অপেক্ষা এখনকার প্রয়োজনীয়তা শতগুণ অধিক।

ভারতের পল্লীতে পল্লীতে অনুশীলন সমিতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে তার নিজস্ব চিন্তাধারা ও কর্মপ্রণালী পুনঃপ্রবর্তন করে মানুষ তৈয়ারীর কাজে নিয়োজিত করতে হবে। বস্তুতঃ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এই সমিতির পুনরুত্থান অবশ্য বাঞ্ছনীয়।

অনুশীলন সমিতি পুনঃ সঞ্জীবিত হয়ে ভারতের যুবক সম্প্রদায়কে যুগে যুগে উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত করুক, নব নব প্রেরণা দিক—নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মত মানুষ তৈয়ারী করুক—সমিতির পুরাতন কর্মীবৃন্দের এই প্রার্থনা জয়যুক্ত ও সাফল্যমণ্ডিত হউক!

পরবর্তী অধ্যায়ে অনুশীলন সমিতির ইতিহাস সর্বভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। দল ও মত নির্বিশেষে নেতা ও কর্মীরা সম্মিলিতভাবে—কখনও বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে—স্বাধীনতালাভের উদ্দেশ্যে বিপ্লবকে সফল করবার জন্যে আত্মনিয়োজিত করেন। অবস্থাটা এইরকম— 'পড়ি গেল কাড়াকাড়ি—আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান, তারি লাগি তাড়াতাড়ি।' এসবেরই পরিণতি বহির্ভারতে মহানায়ক রাসবিহারী বসুর প্রস্তুতি ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর চরম আঘাত—আন্দামানে স্বাধীনতা ঘোষণা ও কোহিমায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং ভারতে নৌ বিদ্রোহ।

বলা বাহুল্য বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিত হলে অনুশীলন সমিতির অবদানই প্রাধান্য পাবে। দুঃখের বিষয় এইরূপ পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এখনও রচিত হয়নি। তবুও এ যাবৎ বিপ্লব সম্বন্ধে যে সব তথ্যনিষ্ঠ পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে তাতে কতক পরিমাণে সেই অভাব পূরণ করবে। যেগুলি পাঠ করলে এই বিপ্লবের গুরুত্ব, প্রভাব ও বিশালতা হৃদয়ঙ্গম হবে। পাঠকবৃন্দের সুবিধার জন্যে সেইরকম কিছু পুস্তকের তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া হল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—ভারতে অধুনা যে মেট্রিক পদ্ধতির মুদ্রা, ওজন ও মাপ প্রচলন হয়েছে তার মূলে সমিতির একজন প্রাক্তন কর্মীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও অটল অধ্যবসায় আছে। ফণীন্দ্রনাথ শেঠ কলেজে পাঠ্যা-

বম্বায়ই এদেশে দশমিক পদ্ধতি চালু করবার কল্পনা করেন। পরে ভারতীয় দশমিক সমিতি নামে এক সংস্থা গঠন ও পরিচালনা করে তার মাধ্যমে ভারত সরকারের সঙ্গে প্রায় ৪০/৪৫ বৎসর যাবৎ পত্রাদি বিনিময় করে এই পদ্ধতি প্রবর্তনে সমর্থ হন। বিপ্লবের সঙ্গে সংযোগ থাকাকালীন তাঁকে অশেষ নির্যাতন সহ্য করতে হয়। তবুও অদম্য উৎসাহ নিয়ে তিনি এই গুরুতর কাজ সম্পন্ন করেন। গভর্ণমেণ্টের নথীপত্রে ফণীন্দ্রনাথের অবদান স্বীকৃত হয়েছে।

সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র বসুর বিবৃতি

ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত স্বনামধন্য পুরুষ। অগ্রজ স্বামী বিবেকানন্দের প্রদর্শিত পথে তিনিও ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বিখ্যাত 'যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদনা করে কারারুদ্ধ ও দ্বীপান্তরিত হন। তাঁর "ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম" নামক পুস্তকে অনুশীলন সমিতি ও বিপ্লবী কর্মীদের সম্বন্ধে বহু তথ্য সন্নিবেশিত আছে। নিচে কিছু কিছু উদ্ধৃত করা হল।

" ··অনুশীলন সমিতির উৎপত্তি বিষয়ে সতীশচন্দ্র বসুর বিবৃতি ঃ

আমি আগে ৺নারায়ণচন্দ্র বসাকের আখড়ায় (গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীট) ব্যায়ামচর্চা করিতাম। এই স্থান হইতে আমি জেনারেল এসেমব্লী কলেজের জিমনাস্টিক ক্লাবে ভর্তি হই। গৌরহরি মুখোপাধ্যায় (ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের খুল্লতাত) এই ক্লাবের মাষ্টার ছিলেন। কলেজের অধ্যাপক Wann উপরোক্ত ব্যায়াম ক্লাবের সভাপতি ছিলেন। কিন্তু ঐ ক্লাবে লাঠিখেলার অনুমতি পাওয়া যায় নাই। এইজন্য ইহার পর মদন মিত্র লেনে একটি ছোট লাঠি খেলার ক্লাব স্থাপন করিলাম। আমরা উপদেশ গ্রহণের জন্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগের নিকট যাইতাম। যথা রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী সারদানন্দ, Sister Nivedita প্রভৃতি। এই সূত্রে সোদপুর তেঘরার শশী চৌধুরী আমাদিগকে ব্যারিষ্টার আশুতোষ চৌধুরীর কাছে লইয়া যান। আমি শশীদাকে বলি আমাদের সভাপতি বা নেতা নাই। চৌধুরী ক্লাবের কথা শুনিয়া বলিলেন, এই কর্মের উপযুক্ত লোক হইতেছেন ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্র। চৌধুরী মিত্রের নামে পত্র দিয়া তাঁহার কাছে আমাদের পাঠাইয়া দেন। তাঁহাকে সব কথা বলিলে তিনি উত্তেজিত হইয়া আমাকে জাপটাইয়া ধরিলেন। পরে তিনি ক্লাবের Commander-in chief বা পরিচালক হইলেন। সাতদিন বাদে তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বরোদা হইতে একটা দল আসিয়াছে—তোমাদের

উদ্দেশ্য অনুযায়ী একই উদ্দেশ্য তাহাদেরও। সর্বপ্রকারের training (সামরিক শিক্ষা) তাহারা দিবে। তাহাদের সহিত তোমাদের amalgamate (সংযোগ) করিতে হইবে।" আমরাও রাজী হইলাম। এই সময়ে উভয় দলে মিল হইয়া গেল। তাহার ফলে যে দল গঠিত হইল তাহার সভাপতি হইলেন প্রমথনাথ মিত্র, সহকারী সভাপতি হইলেন চিত্তরঞ্জন দাস (দেশবন্ধু) ও অরবিন্দ ঘোষ, কোষাধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই সঙ্গে দলে আসিলেন, অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্রনাথ হালদার (চিত্তরঞ্জনের শ্যালক) ব্যারিষ্টারদ্বয়। সভ্যদের ঘোড়ায় চড়া অভ্যাস করার জন্য হালদার মহাশয় একটি ছোট ঘোড়া দলকে দান করিয়াছিলেন। এই সঙ্গে একটি ব্যায়ামের আখড়া ১০২ নং (১১০৮) আপার সার্কুলার রোডে স্থাপিত হইল। বরোদা হইতে আগত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে স্বামী নিরালম্ব) বলিলেন মদন মিত্র লেনের আখড়া পৃথকভাবে থাকুক। আমাদের অল্প বয়সের সভ্যেরা (Junior members) মদন মিত্র লেনের আখড়ায় থাকুক আর বয়স্ক সভ্যরা (Senior members) যতীনবাবুর নেতৃত্বে আপার সার্কুলার রোডের আখড়ায় ব্যায়াম অভ্যাস করুক।

এই সময়ে অরবিন্দ একবার ছদ্মবেশে মদন মিত্র লেনের আখড়ায় আসিয়াছিলেন। এই কথা আমি মিত্র মহাশয়ের কাছ হইতে শ্রবণ করি।...

ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জী লিখিত বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি

যাদুবাবুর মূল্যবান গ্রন্থ থেকে সমিতির গঠন, লক্ষ্য ও পরিচালন সম্বন্ধে কয়েকটি প্রামাণ্য তথ্য সংগৃহীত হল।

"...অনুশীলন সমিতির জন্ম, উত্থান ও ভাগ্য-বিপর্যয়ের ইতিহাস দেশের, বিশেষ করে বাংলাদেশের, নবযুগের ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িত। মানুষ হিসাবে যদি আমরা কিছুই না হলাম তবে উন্নতি, স্বাধীনতা, এসব কথা অর্থ হীন হয়ে যায়।

এ রকম প্রশ্ন উঠেছিল প্রবর্তকদের মনে। নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলের হেড মাস্টার নরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য—সতীশ বসু, পুলিন মুখার্জী প্রভৃতির সঙ্গে চিন্তার মিল পেয়ে প্রথমে তাঁর স্কুলে সমিতির অধিবেশন করেন। দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক উৎকর্ষ সাধনের দিকে তাঁহাদের নজর গিয়াছিল। এই রকম অবস্থায় সমাজের সেবায় তাঁরা মন দেন। আর্তের সেবা, বিপন্নকে সাহায্য ছিল বড় একটা দফা তাঁদের কার্য-সূচীতে। বঙ্কিমবাবুর ঢালা ছাঁচে তাঁরা নিজেদের গড়তে চাইলেন।

দেশ, দেশ, আমাদের এই দেশ! একেই আমাদের বড় করতে হবে। ধর্মে, কর্মে, জ্ঞানে, সব রকমে একে তুলতে হবে। 'সমিতি' প্রবল দেশপ্রেমের ডাক শুনল—বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট, যোগেন বিদ্যা-ভূষণের নিকট, এবং সর্বশেষে জীবন্ত, জাগ্রত, তেজোবীর্য-সম্পন্ন বিবেকানন্দের কাছে। সেবা-সমিতি প্রেরণার উৎস সন্ধানে গিয়ে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

বিবেকানন্দের বাণী—'ওঠো, জাগো, শ্রেষ্ঠ জনের কথা শুনে এগিয়ে চলো'—ভারতের আনাচে কানাচে পৌঁছেছিল। স্বামীজীর দেহান্তের পূর্বে 'সমিতি'র প্রতিষ্ঠা-কর্তারা সাক্ষাৎ ভাবে স্বামীজীর সঙ্গে মেলা-মেশার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিলেন, উপদেশ অনেক নিয়েছিলেন।

অনুশীলন সমিতি প্রকাশ্য কর্মভার নিয়ে চলতে আরম্ভ করে। এর কার্যসূচী ও কর্মীদের সেবাকার্য দেশের সহানুভূতি আকর্ষণ করে।

অনুশীলন সমিতি সমগ্র বাংলায় একটা ছিল। সঞ্চালক বা নির্দেশক (Director) ছিলেন মিত্তির সাহেব (ব্যারিষ্টার পি. মিত্র)। সমিতির নাম মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবে ছড়িয়ে পড়ল।

সমিতির নির্দেশক দুটি কার্যকরী কেন্দ্র বা চক্র গঠন করেন :—

(ক) আভ্যন্তরীণ (Inner circle)।

(খ) বহির্ভাগীয় (Outer circle)।

আভ্যন্তরীণ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা গুপ্ত বিভাগের মতোই ছিল। সাধারণ সভ্যেরা এটির সংবাদ জানতেন না। এইখান দিয়ে অরবিন্দ, যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (স্বামী নিরালম্ব), সি. আর. দাস (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন), সুরেন ঠাকুর প্রভৃতির সঙ্গে 'অনুশীলন'-এর নির্দেশক মিত্র সাহেবের সঙ্গে যোগ ছিল। সমিতির কর্তৃপক্ষ দেশব্যাপী গঠনকার্য কতকটা সামরিক ঢঙে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

গঠনকার্য সম্পন্ন হলে বৈদেশিক শাসনযন্ত্র ধ্বংস করার জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করবেন, এইরূপ ভাবধারা কর্তৃপক্ষের মনে ছিল।

বহির্ভাগীয় বিভাগ জনমত গঠন ও গণসহানুভূতি লাভের কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করত। সমিতির সভ্যদের মন, মত, শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি, সাধারণ ও বিশেষ শিক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখা হয়। প্রচার, আন্দোলন, আনুষ্ঠানিক গঠন এদিক দিয়ে চল্‌ত। লোক-সংগ্রহ হত এবং এর থেকে লোক বাছাই করা হত। ভবিষ্যত বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। সারা বাংলায় এইভাবে আগামী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি চলেছিল।

Criminal Law Amendment Act of 1908 দ্বারা বাংলার অনুশীলন সমিতি ১৯০৮ সালে ডিসেম্বর মাসে বে-আইনী ঘোষিত হয় এবং উঠে যায়। উহার সঙ্গে কলিকাতার আত্মোন্নতি সমিতি, বরিশালের বান্ধব সমিতি, ময়মনসিংহের সাধনা সমিতি, সুহৃদ-সমিতি, ফরিদপুরের ব্রতী সমিতিও বে-আইনী ঘোষিত হয়।

'অনুশীলন সমিতি' প্রকাশ্যভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সভ্যদের অনেকের মনে একটা প্রচণ্ড ক্ষোভ জাগে। নরেন ভট্টাচার্য (আধুনিক এম. এন. রায়) জ্ঞান মিত্র, সুধীর রায়চৌধুরী এই অবস্থাটা মেনে নিতে

চাইছিলেন না। তাঁরা যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘা যতীন) কাছে যাতায়াত বাড়ালেন এবং সরকারকে একটা প্রখর জবাব তখনই দেবার পক্ষপাতী হন। যতীন্দ্রনাথ দেশের অবসাদ ও দুর্দশাকে চুপচাপ মেনে বসে থাকার বিরোধী ছিলেন।

যশোহর জেলার মাগুরা অঞ্চলের অনুশীলন-এর নেতা হীরালাল রায় যতীন মুখার্জীকে (বাঘা যতীন) অনুশীলন-এর সঞ্চালক পি. মিত্রের কাছে নিয়ে যান। এর থেকে তিনি প্রধান দল বা অনুশীলন-এর সভ্য হন। রাত্রে অনুশীলন সমিতির ৪৮নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের অফিসে আরো কিছু পুরানো সভ্যের সঙ্গে তিনিও আসতেন। এইজন্য অনুশীলনের ছেলেরা তাঁর সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছিল—যেমন নরেন ভট্টাচার্য, হরিকুমার চক্রবর্তী, বীরেন দত্তগুপ্ত, জ্ঞান মিত্র প্রভৃতি।

যুগান্তর

আসল গোলমাল সৃষ্টি হচ্ছে দুটো দল নিয়ে—অনুশীলন ও যুগান্তর। প্রকৃত ঘটনা অবলম্বন করে অনুসন্ধান করলে জানা যাবে প্রথমে একটাই বড় দল ছিল—'অনুশীলন সমিতি'। এরই ভিতর থেকে যুগান্তরের উদ্ভব। কিন্তু যুগান্তরের বিস্তৃতি হয়েছে অন্যান্য ঝাঁক বা উপদলগুলিকে সঙ্গে নিয়ে। যুগান্তর নাম নিয়ে দল চলে ১৯২০ সালেরও পর। এই নামের প্রতি সশ্রদ্ধ অন্তরে নতি জানিয়েছেন বহু তেজোদীপ্ত সুধী, ত্যাগী, তাপস, বীর। 'যুগান্তর' নামটারই কেমন যেন একটা মন মাতানো শক্তি ছিল। 'যুগান্তর' কাগজ থেকেই দলের নাম ঐ হয়েছিল। (পত্রিকার জন্ম মার্চ ১৯০৬ সালে)

অনুশীলন সমিতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সংযোগ

সতীশচন্দ্র বসু যে কয়জন অগ্রণী যুবকের সাহচর্য ও সানুকূল্যে অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁদের অন্যতম যতীন্দ্রনাথ শেঠ।

যতীন্দ্রনাথ তাঁহার সহধর্মিণী শেফালিকা শেঠ প্রণীত 'সঙ্গীত শাস্ত্র কণিকা'র একস্থানে মন্তব্য করেছেন—

"বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-পুস্তক গীতবিতানের স্বদেশখণ্ড সম্পর্কে একটা ঐতিহাসিক ঘটনা লিপিবদ্ধ করা উচিত।

স্বদেশী আন্দোলনের উত্তাল মুহূর্তে অনুশীলন সমিতির প্রধান কার্যালয় কলিকাতাস্থ ৪৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের সন্নিকটে মদন মিত্র লেনস্থিত ক্রীড়াপ্রাঙ্গনে শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সমিতির যুবসঙ্ঘের সহিত কয়েকবার মিলিত হন এবং সামান্য একটি কাঠের টুলে বসিয়া তাঁহার নবরচিত কয়েকটি বাউল গান প্রাণের উচ্ছ্বাসে গাহিয়া শোনান। সেগুলির সাধারণ্যে প্রথম প্রচার এইরূপে হয়। নিম্নলিখিত গানগুলি এইরূপে সমিতির সভ্যদিগকে তাহাদের ব্রতে উৎসাহিত করিবার জন্য মুখ্যতঃ রচিত হয়। কবির উদাত্ত কণ্ঠে গীত আহ্বানের শ্রোতা এখনও কয়েকজন জীবিত আছেন।

১। ও আমার দেশের মাটি তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা

২। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে

৩। তোর আপনজনে ছাড়বে তোরে

৪। আপনি অবশ হলি তবে বল দিবি তুই কারে

৫। নিশিদিন ভরসা রাখিস ওরে মন হবেই হবে

৬। আমি ভয় করবো না, ভয় করবো না

৭। এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে

৮। নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়, খুলে যাবে এই দ্বার

৯। ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে

১০। আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে

১১। আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।

বলা বাহুল্য স্বাধীনতা সংগ্রামের দুঃসাহসিক ব্রতে ব্রতী যুবকবৃন্দকে উদ্দীপনা যোগাইবার উদ্দেশ্যেই রবীন্দ্রনাথ এই গানগুলি রচনা করিয়াছিলেন।" এই সংযোগের সূত্র হিসাবে যতীন্দ্রনাথ আরও জানাইয়াছেন: জোড়াসাঁকো শিবকৃষ্ণ দাঁ লেনস্থিত শিবমন্দির প্রাঙ্গণে

অনুশীলন সমিতির একটি শাখা খোলা হইয়াছিল। সেইখানে রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথ সভ্য হইয়াছিলেন। বয়স ১৪।১৫ বৎসর হইবে। ঐ ক্লাবে পাড়ার ২০।২৫ জন যুবক মিলিত হইত। যতীন্দ্রনাথ বড় লাঠি ও Boxing শেখাতেন। একদা রথীনের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ রবিঠাকুরের বাড়ী গিয়া তাঁহার সহিত এই বিষয়ে আলাপ আলোচনা করেন। রবিঠাকুর বলেন, "তোমরা যুবক কর্মী, আমি কবি মানুষ। কবিতা লিখি গান করি। তোমাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তোমাদের মনকে জাগাবার জন্য কতকগুলি গান রচনা করব ও শোনাব।"

রবীন্দ্রনাথ আরও বলেন তাঁদের বাড়ীতে তাঁর অগ্রজেরা এবং তৎকালীন বাঙালী চিন্তাশীল নেতৃবৃন্দ যথা নবগোপাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি আলোচনা করতেন—কিভাবে দেশকে স্বাধীন করা যায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে কবি 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধ রচনা ও পাঠ করেন।

কিছুকাল পরে দেশে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে জ্ঞানলাভের জন্য রথীন ঠাকুর, নগেন গাঙ্গুলী, সন্তোষ মজুমদার প্রভৃতি আমেরিকা যাত্রা করেন। তাঁহাদের শুভকামনায় সমিতির কেন্দ্রস্থলে (৪৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট) একটি প্রীতি-সম্মেলনের আয়োজন হয়। তাতে রবীন্দ্রনাথ যোগদান করেন, সমিতিকে অভিনন্দন জানান ও সভ্যবৃন্দের সঙ্গে আহারাদি করেন। যতীন্দ্রনাথ স্বয়ং ১৯১০ সালে আমেরিকা যাত্রা করেন ও প্রসিদ্ধ Harvard University-তে অধ্যয়ন করে B A. Degree লাভ করেন। তিনি ২৯শে আগষ্ট ১৯১৩ সালে ফিরে আসেন এবং বাংলায় বিপ্লব আয়োজনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

ঢাকা অনুশীলন সমিতি

শ্রীনলিনীকিশোর গুহ প্রণীত "বাংলায় বিপ্লববাদ" নামক তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ থেকে সংকলিত :—

"...১৯০৫ সালে পি. মিত্র ও বিপিনচন্দ্র পাল ঢাকা গমন করেন। তথায় অনুশীলন সমিতির শাখা স্থাপন করেন এবং পুলিনবিহারী দাসের উপর উহার পরিচালনার ভার দেন। সেই উপলক্ষে এক বৈঠকে পি. মিত্র বলেন, কেবল স্বদেশী ও বয়কটে ইংরেজ দেশ ছাড়িবে না। কেহ কেহ প্রশ্ন করেন, কিসে যাইবে? মিত্র মহাশয় দৃপ্ত কণ্ঠে বলেন—"মেরে তাড়াতে হবে। আমাদের অসি কোষমুক্ত হয়েছে আর পেছলে চলবে না।" পুলিনবাবুর উপর পূর্ব বাংলার সমিতি-সংগঠনের ভার প্রদত্ত হইল। কলিকাতার ভার রহিল সতীশ বসুর উপর। বলা বাহুল্য, পি. মিত্র সর্বাধিনায়ক। এই সময় পি. মিত্রের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের কোন কোন বিষয়ে মতভেদ হইতেছিল। তাহা উভয়ের ব্যক্তিগত সম্পর্ক না হউক উভয়ের অনুরাগীদের দ্বারা ঘটিতেছিল। প্রকৃতপক্ষে মুরারিপুকুরের গুপ্ত আড্ডায় অস্ত্র সংগ্রহ, বিপ্লবাত্মক কর্মপ্রয়াস—মজঃফরপুর অভিযান—বারীনবাবুর নেতৃত্বেই হইয়াছিল, সতীশবাবু বা মিত্র মহাশয়ের সাক্ষাৎ সম্পর্ক উহাতে ছিল না এবং দুইটি দল যেন স্বতন্ত্র হইয়া পড়িল। পরবর্তীকালে কলিকাতার মূল অনুশীলন সমিতির কর্মপ্রবণতা দেখা যায় না। পি. মিত্রের মৃত্যুর পরে ক্রমশঃ সংস্থা হিসাবে উহা স্তিমিত হইয়া আসে। কিন্তু এই মূল সমিতির শাখা হিসাবে ঢাকা অনুশীলন সমিতি সুবিস্তৃত হইয়া পড়ে। পরবর্তীকালে অনুশীলন সমিতি বলিতে ঢাকার এই অনুশীলন সমিতিকেই সাধারণতঃ বুঝাইত। এই অনুশীলনই পূর্ব ও উত্তর বাংলায়, কলিকাতায় এবং বাংলার বাহিরে ছড়াইয়া পড়ে।

এক উত্তর কলিকাতায়ই অনুশীলনের ৪০।৫০টি আখড়া ছিল বলিয়া জানা যায়। বস্তুতঃ পুলিশ কলিকাতার বিপ্লবী কর্মী ও নেতাদের পিছনে লাগিয়া ঐ সময়ে তাহাদেরও ব্যতিব্যস্ত করিয়াছে। ঢাকার অনুশীলন, ময়মনসিংহের সুহৃদ ও সাধনা (হেমেন্দ্র আচার্যের দল), বরিশালের স্বদেশ-বান্ধব ও ফরিদপুর ব্রতী সমিতির উপরই ১৯০৯ সালে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। তবে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাসে অনুশীলন ব্যতীত আর চারটি সমিতির নামই ক্রমে তলাইয়া যায়।



সত্যেন্দ্রনাথ বসু

১৯১২ সালেই অনুশীলনের সঙ্গে চন্দননগরের মতিলাল রায় ও রাসবিহারী বসুর বিপ্লবী-দলের যোগাযোগ ঘটে। অনুশীলনের মাধ্যমেই কাশীর শচীন্দ্রনাথ সান্যালের সহিত রাসবিহারীর পরিচয় ঘটে। ১৯১৩-১৪-১৫ সালে কার্যকরীভাবে রাসবিহারী উত্তর ভারতের সংস্থার সঙ্গে এই সূত্রেই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটে। ভারতব্যাপী বিপ্লব সাধনের জন্য এই মিলিত দলের প্রয়াসে নেতৃত্ব করেন বিপ্লবী নায়ক রাসবিহারী। এই মিলিত দল সম্পর্কে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল তাঁহার 'বন্দীজীবনে' লিখিতেছেন :—পুলিনবাবু ১৯০৭ সালে নির্বাসিত হন। ১৯১০ সালে মুক্তিলাভ করেন। মুক্তির অল্পকাল পরেই ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় ধৃত ও দণ্ডিত হইয়া দীপান্তরে ৭ বৎসর আবদ্ধ থাকেন। ১৯১০ সালের পরে পুলিনবাবুর সাক্ষাৎ নেতৃত্ব থাকে না। যাঁহারা ঢাকা সমিতির নেতৃত্ব-স্থানীয় ছিলেন (এই সময়ের নেতৃস্থানীয় নরেন্দ্র সেন, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, প্রতুল গাঙ্গুলী, অমৃত হাজরা প্রভৃতি) তাঁহারা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে দেশের বিভিন্ন দল মিলিয়া সম্পূর্ণ একমত হইতে না পারিলে দেশের মঙ্গল নাই। তাই তাঁহারা দেশের সকল দলের সহিতই মিলিতে ইচ্ছুক হইলেন। সেইজন্যই ঢাকা সমিতি চন্দননগরের দলের সহিত মিলিত হইয়া যায়। কাশীর দলও এই ঢাকা সমিতির মারফতেই রাসবিহারীর উত্তর ভারতের দলের সহিত পরিচিত হয়। এইরূপে আমাদের দল পূর্ব বাংলা হইতে আরম্ভ করিয়া পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া একযোগে কাজ করিতে থাকে। লাহোর, দিল্লী, কাশী চন্দননগর ও ঢাকার বিপ্লবী দল এইরূপে সর্বাংশে এক হইয়া যায়। একথা কিন্তু বাংলার অবশিষ্ট বিপ্লবী দল ঘুর্ণাক্ষরেও জানিতে পারে নাই।

Sedition Committee Report—Mr. Justice S.A.T. Rowlatt

স্বদেশী আন্দোলনের সময় ব্রিটিশ সরকার বাংলাদেশে বিপ্লবের কারণ, বিস্তার ও তা দমনের উপায় নির্ধারণ জন্যে যে কমিটি নিয়োগ করেন তার কমিটির নাম সিডিশন (রাজদ্রোহ) কমিটি। ১৯১৮ সালে

রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। কমিটির সভাপতি রাউলাট সাহেবের নামে ঐ রিপোর্ট **Rowlatt Act** নামে সুপরিচিত।

এই রিপোর্টের প্রধান অংশে অনুশীলন সমিতির সংগঠন, সংবিধান ও কর্মপদ্ধতির বিস্তারিত বর্ণনা আছে। বাংলা সংক্ষিপ্তসার নিচে উদ্ধৃত হল।

...বিপ্লবের ভাবধারায় প্রভাবিত যুবকবৃন্দ অনুশীলন সমিতি নামে একটি সংস্থা স্থাপন করে। (অনুশীলন অর্থ মনোবৃত্তির উৎকর্ষসাধন)। পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলিকাতায় ও পূর্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকায় উহা স্থাপিত হয়। চতুর্দিকে উহার শাখাপ্রশাখা বিস্তৃত হয়। এক সময়ে ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রায় ৫০০ শাখা শহরে ও মফঃস্বলে প্রসারিত ছিল। ইহা ব্যতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলেও যুবকবৃন্দ সংগঠিত হইতে থাকে। কিন্তু সকলে একই বিদ্রোহ মনোভাবাপন্ন। তাঁহারা একজোটে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করিলেন যাহাতে তাঁহাদের দলবৃদ্ধির সহায়তা হয় ও কার্যকলাপের সুবিধা হয়। এইরূপ পরিবেশ সৃষ্টির প্রধান উপায় ছিল—সংবাদপত্রে প্রচার, সভা সমিতিতে বক্তৃতা জাতীয় উদ্দীপনাপূর্ণ সাহিত্য ও সঙ্গীত ইত্যাদি।

সমিতির সভ্যবৃন্দের শিক্ষার জন্য অদ্ভুত রকমের পাঠ্যসূচী স্থির করা হইয়াছিল। যথা—ভগবদ্গীতা, বিবেকানন্দ রচনাবলী, ম্যাটসিনী ও গ্যারীবল্ডির জীবনচরিত প্রভৃতি। শক্তি উপাসনার জন্য "ভবানী মন্দির" নামক পুস্তক পাঠ করিতে হইত।

এইরূপ শিক্ষা দেওয়া হইত যে প্রত্যেক ভারতবাসীকে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধান করিতে হইবে। ধর্মের উপর ভিত্তি করিয়া শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে।

"বর্তমান রণনীতি" নামক আর একখানি পুস্তকের মাধ্যমে প্রচার করা হইয়াছিল যে যদি সহজে বৈদেশিক নিষ্পেষণ বন্ধ করা না যায় তবে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। দেশের যুবশক্তিকে গেরিলা যুদ্ধে নিয়োজিত করিতে হইবে। তবেই তাহারা নির্ভীক ও অসিযুদ্ধে পারদর্শী হইবে। তাহাদিগকে বীর্যবান ও বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে।

অনুশীলন সমিতির সভ্যদের প্রতিজ্ঞা

অনুশীলন সমিতির সংগঠন ও শাখাসমূহের সহিত সংযোগের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় Sedition Committee Report (Rowlatt) ৫ম অধ্যায়ে।

১৯০৮ সালে ঢাকা অনুশীলন সমিতির কেন্দ্র সার্চ করে পুলিশ বহু গোপনীয় কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করে। পুলিন দাসের নির্দেশনামায় সভ্যদের প্রতিজ্ঞা সমূহের উল্লেখ আছে। সেগুলির সারমর্ম নিম্নে দেওয়া হল।

সমিতির তুটি অঙ্গ ছিল—প্রকাশ্য ও গুপ্ত। এর মধ্যেও আবার স্তরের বিভেদ ছিল। নিম্নস্তরের কোন সদস্য তার কাজে নিপুণতা ও বিশ্বস্ততা দেখালে উচ্চতর স্তরে পৌঁছবার অধিকারী হত। প্রতি স্তরের সদস্যদেরই একটি প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হত। এইরকম চারটি স্তরের প্রতিজ্ঞাগুলি যথাক্রমে—(১) আদ্য (২) অন্ত্য (৩) প্রথম বিশেষ ও (৪) দ্বিতীয় বিশেষ—নামে অভিহিত।

আদ্য প্রতিজ্ঞা নিয়ে মাত্র প্রকাশ্য সমিতির সদস্য থাকা যেত। ক্রমে কাজের ভিতর দিয়ে যারা যোগ্য বিবেচিত হত তাদের অন্ত্য প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়ে গুপ্ত সংস্থার সভ্য করা হত।

আদ্য প্রতিজ্ঞা

(১) আমি কখনও সমিতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইব না।

(২) (ক) আমি সর্বদা সমিতির নিয়ম মানিয়া চলিব।

(খ) আমি বিনাবাক্যে কর্তৃপক্ষের আদেশ পালন করিব।

(গ) আমি পরিচালকের নিকট হইতে কোনও কিছু গোপন করিব না এবং সত্য ছাড়া আর কিছু বলিব না।

অন্ত্য প্রতিজ্ঞা

(১) আমি সমিতির আভ্যন্তরীণ বিষয়ে কোনও তথ্য অন্য কাহারও নিকট প্রকাশ করিব না।

(২) আমি পরিচালককে না জানাইয়া অন্যত্র যাতায়াত করিব না। সমিতির বিরুদ্ধে কোনও ষড়যন্ত্রের সংবাদ পাইলে তাঁহাকে জানাইব।

(৩) আমি যখন যেখানে যে অবস্থায় থাকি না কেন পরিচালকের আদেশ অনুযায়ী তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিব।

(৪) আমি উপরোক্তরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া এই সমিতি হইতে যাহা কিছু শিক্ষা লাভ করিব তাহা অনুরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সভ্য ব্যতীত অন্য কাহাকেও শিখাইব না।

প্রথম বিশেষ প্রতিজ্ঞা
ওঁ বন্দে মাতরম্

(১) ঈশ্বর, মাতা, পিতা, গুরু ও পরিচালকের সাক্ষাতে আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে সমিতির উদ্দেশ্য সফল না হওয়া পর্যন্ত এই কেন্দ্র পরিত্যাগ করিব না। আমি পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, গৃহ, সংসার প্রভৃতির আকর্ষণে আবদ্ধ থাকিব না।

কোনও রকম অজুহাত বিনা পরিচালকের নির্দেশ অনুযায়ী কেন্দ্রের সকল প্রকার কার্য করিব।

আমি এই সকল কাজে যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করিয়া নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিব। ইহার জন্য সকল প্রকার বাচালতা ও চপলতা পরিত্যাগ করিব।

(২) যদি আমি এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি তাহা হইলে ব্রাহ্মণ, পিতামাতা এবং সকল দেশের দেশপ্রেমিকদের অভিশাপ যেন আমাকে ভস্মীভূত করে।

দ্বিতীয় বিশেষ প্রতিজ্ঞা
ওঁ বন্দে মাতরম্

(১) ঈশ্বর, অগ্নি, মাতা, গুরু এবং পরিচালকদের সাক্ষী রাখিয়া এবং তাঁহাদের সম্মুখে আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে সমিতির উন্নতির জন্য এই কেন্দ্রের সমুদয় কার্য সম্পন্ন করিব এবং তজ্জন্য আমার জীবন-সর্বস্ব পণ করিব।

(২) আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আভ্যন্তরীণ গুপ্ত বিষয় কাহারও সহিত আলোচনা করিব না এবং আমার আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবদিগকে বলিব না।

(৩) যদি এই প্রতিজ্ঞা পালনে আমি অপারগ হই অথবা ইহার বিরুদ্ধাচরণ করি তাহা হইলে ব্রাহ্মণদের, মাতার এবং বিভিন্ন দেশের দেশপ্রেমিকদের অভিসম্পাতে আমি যেন ধ্বংসপ্রাপ্ত হই।

* * *

বলা বাহুল্য এই প্রতিজ্ঞাগুলির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল চরিত্রগঠন, নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলাবোধ ও মন্ত্রগুপ্তি। কোন প্রকার দীক্ষাগ্রহণ না করলে কেউ অনুশীলন সমিতির সভ্য হতে পারত না।

এইরকম জীবনসর্বস্ব পণ করে অনুশীলন সমিতির সভ্যরা আত্মোৎসর্গ করেছিল বলেই উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল।

গুপ্ত সমিতির আদি পর্ব

প্রথম গোপন সমিতি—হানচু পামু হাফ

বাংলার নবজাগরণের যুগে সমগ্র দেশের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলির মধ্যে প্রধান ছিল জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ী। স্বভাবতঃই স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে এই ঠাকুর বাড়ীতেই প্রতিষ্ঠিত হল প্রথম গোপন সমিতি—"সঞ্জীবনী সভা"। এ বিষয়ে প্রধান উদ্যোগে ছিলেন ঋষি রাজনারায়ণ বসু। সমিতির সভ্যদের গোপন ভাষায় এর নাম ছিল "হানচু পামু হাফ"।

ঠাকুর বাড়ীর এই সঞ্জীবনী সভা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর "জীবনস্মৃতি"তে লিখেছেন—"জ্যোতি দাদার উদ্যোগী আমাদের একটি সভা হইয়াছিল, বৃদ্ধ রাজনারায়ণ ছিলেন তাহার সভাপতি। ইহা স্বদেশীদের দল। কলিকাতায় এক পোড়ো বাড়ীতে সেই সভা বসিত। সভার সকল অনুষ্ঠান রহস্যাবৃত ছিল।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে লিখেছেন—"সভার নিয়মাবলী অনেকই

ছিল, তার মধ্যে প্রধান ছিল মন্ত্রগুপ্তি। অর্থাৎ এ সভায় যাহা কথিত হইবে, যাহা কৃত হইবে এবং যাহা শ্রুত হইবে তা অ-সভ্যদের নিকট প্রকাশ করিবার অধিকার কাহারও থাকিবে না। ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকাগার হইতে লাল রেশম জড়ানো বেদমন্ত্রের একখানা পুঁথি এই সভায় আনিয়া রাখা হইয়াছিল। টেবিলের দুই পাশে দুইটি মড়ার মাথা থাকিত, তাহার দুইটি চক্ষু কোটরে দুইটি মোমবাতি বসানো ছিল। মড়ার মাথাটি মৃত ভারতের সাঙ্কেতিক চিহ্ন। বাতি দুইটি জ্বালাইবার অর্থ এই যে মৃত ভারতে প্রাণসঞ্চার করিতে হইবে ও তাহার জ্ঞান চক্ষু ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। সভার প্রারম্ভে বেদমন্ত্র গীত হইত— "সংগচ্ছধ্বম সংবদধ্বম।" ইহার দীক্ষানুষ্ঠানে এক ভীষণ গাম্ভীর্য্য ছিল। দীক্ষাকালে দীক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গ অদ্ভুত ভাবাবেগে শিহরিয়া উঠিত।"

যে পোড়ো বাড়ীতে সভা বসত তার অবস্থিতি ছিল ঠন্ঠনিয়া অঞ্চলে। বাড়ীর মালিক কে তা কেউ জানতো না। সভার কার্য্য-বিবরণী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্ভাবিত এক গুপ্ত ভাষায় লেখা হত।

ঠিক সেই যুগেই গ্যারিবল্ডী জীবনী প্রণেতা যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ বাঙ্গালী যুবক সম্প্রদায়কে ভাবী স্বাধীনতা সংগ্রামের উদ্দীপনা যোগাইতেন। তিনি কলিকাতায় ৪নং শ্যামপুকুর লেনে বাস করিতেন। অনুমান ১৯০১ সালে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বরোদা হইতে আসিয়া প্রথমে এইখানেই তাঁহার সহিত মিলিত হন এবং একত্রে এই বাড়ীতেই বাংলার প্রথম বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি স্থাপন করেন। পরে শৃঙ্খলার সহিত কাজকর্ম পরিচালনার জন্য উহা ১০২ নং আপার সার্কুলার রোডে স্থানান্তরিত হয়।

এই গুপ্ত সমিতি সম্বন্ধে প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যাবে গৌতম চট্টোপাধ্যায় ও সুভাষ চৌধুরী সম্পাদিত "সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর—শতবার্ষিক সংকলন" নামীয় পুস্তকে। আবশ্যকীয় অংশগুলি উদ্ধৃত হইল :—

"বিংশ শতাব্দীর গোড়াতে বাংলাদেশে বিপ্লবী সংগঠন প্রথম দানা বাঁধতে লাগল—তার সূচনা করলেন ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্র। তাঁকে শক্তি জোগালেন যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (নিরালম্ব স্বামী), ভগিনী

নিবেদিতা, চিত্তরঞ্জন দাশ ও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বরোদা থেকে এসে এঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন অরবিন্দ ঘোষ।

প্রসিদ্ধ বিপ্লবী নেতা ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এ বিষয়ে লিখেছেন—"প্রমথনাথ মিত্র মহাশয় বলিতেন, ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের 'বঙ্গীয় বৈপ্লবিক সমিতি' স্থাপনের পূর্বে, কয়েকবার তিনি বৈপ্লবিক সমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন। পূর্বে বারবার তাঁহার এই উদ্যম ব্যর্থ হয়। শেষে তিনি অরবিন্দ, চিত্তরঞ্জন দাশ, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির সহযোগে বৈপ্লবিক দলের নেতা হন। পরে তিনি বলিতেন, এইবার তাহার উদ্যম স্থায়ী হইয়াছে।" (ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম)।

প্রমথ মিত্র ছাড়াও, ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের, তাঁকে তিনি বড়দিদির মত শ্রদ্ধা করতেন। নিবেদিতার সঙ্গে বাঙ্গালী বিপ্লববাদীদের যোগাযোগ তো সুবিদিত। নিবেদিতারই উদ্যোগে জাপানী শিল্পী ও বিপ্লববাদী কাকুজো ওকাকুরা* ভারতবর্ষে আসেন ১৯০১ সালের গোড়ার দিকে। নিবেদিতার মারফতই ওকাকুরার যোগাযোগ হয় বাংলাদেশের তৎকালীন বিপ্লবী সংগঠকদের সঙ্গে, যাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিলেন সুরেন ঠাকুর।"

কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথও লিখেছেন—

"বাংলার গুণীমহলে মেলামেশা করার বিষয়ে সুরেন দাদা ওকাকুরাকে খুব সাহায্য করেছিলেন। দুজনে খুব বন্ধুত্ব হল। ওকাকুরার সঙ্গে নিবেদিতা, জগদীশচন্দ্র বসু ও আমার দাদা গগনেন্দ্রনাথেরও বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হল। ওকাকুরার কথাবার্তা ও চিন্তা-ধারার দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে তাঁর কাছে ক্রমশ আসতে লাগল দলে দলে যুবকেরা। কয়েক মাসের মধ্যে এদের মনে কিছু আদর্শের বীজ তিনি বুনে দিয়েছিলেন, যা অঙ্কুরিত হবার পরে বাংলাদেশে বিপ্লব এনে দিল।

* Kakuzo (পদবী) Okakura (নাম) শিক্ষাবিদ, শিল্পী, গ্রন্থকার The Ideals of the East, নিবেদিতার আমন্ত্রণে ভারত ভ্রমণে আসেন। বাঙ্গালী মনীষিদের সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেন—"ভারতবর্ষ এক মহান দেশ, তবু পরাধীন কেন? স্বাধীনতা লাভের জন্য তাদের সচেষ্ট হতে হবে।"

বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লববাদের প্রবর্তক স্বামী নিরালম্ব

ভারতবর্ষকে বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত করতে রীতিমত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করতে হবে, সামরিক অভ্যুত্থান ঘটাতে হবে, এই পরিকল্পনা যাঁর মনে প্রথম উদয় হয়েছিল তাঁর নাম যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পরবর্তী কালের প্রসিদ্ধ বিপ্লবী যতীন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নামের সঙ্গে তাঁর নামের সাদৃশ্য থাকায় তাঁর প্রকৃত পরিচয় অস্পষ্ট রয়ে গেছে। বিশেষতঃ বাঘা যতীন শৌর্যে, বীর্যে জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করে ছিলেন। পরন্তু যতীন্দ্রনাথ সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হন এবং স্বামী নিরালম্ব নাম গ্রহণ করে নির্জনে সাধনা ও সিদ্ধিলাভ করেন।

প্রকৃতপক্ষে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ই বাংলার বিপ্লববাদের প্রবর্তক—ব্রহ্মাপ্রপিতামহ। সুখের বিষয় স্বাধীনতা লাভের পর থেকে তাঁর পরিচয় জনসাধারণের সম্মুখে প্রকাশিত হচ্ছে।

বর্ধমানের কাছে খানাজংসন ষ্টেশন থেকে প্রায় তিন মাইল উত্তর দিকে চান্না গ্রামে ১৮৭৭ খৃঃ ১৯শে নভেম্বর তারিখে যতীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের পাশে একটি ছোট নদী প্রবাহিত, নাম "খড়ি"। স্বাস্থ্যকর স্থান, অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য।

মাতৃভূমিকে শৃঙ্খলমুক্ত করতে হলে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হতে হবে—এই উদ্দেশ্য কোথায় সিদ্ধ হবে, যৌবনকালে যতীন্দ্রনাথ তাই অনুসন্ধান করতে থাকেন। তখন বাঙালীকে সকলেই ভয় করত, কোন প্রদেশে সৈন্যদলে ভর্তি করা হত না। অনুমান ১৮৯৭ খৃঃ তিনি দেশীয় রাজ্য বরোদায় গমন করেন এবং নিজের নাম বিকৃত করে "যতীন্দর উপাধ্যায়" নামে সেখানকার অশ্বারোহী বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করেন। দৈবযোগে সেই সময় শ্রদ্ধেয় শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ মশাই সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (কেবল মাত্র অশ্বারোহণে) উত্তীর্ণ না হওয়াতে বরোদা রাজ্যে শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হন। এই সুযোগে যতীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে মন্ত্রণা করেন যে বিদেশে পড়ে থাকা বৃথা শক্তি ও সামর্থের অপচয়—বাংলায় ফিরে বিপ্লবের আয়োজন করতে হবে। স্বাধীনতা লাভের এই প্রকৃষ্ট উপায় স্থির করে তাঁরা অনুমান ১৯০২ সালে বাংলায় ফিরে

আসেন। তাঁরা কলকাতায় ৪নং শ্যামপুকুর লেনে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মশায়ের বাড়ীতে মিলিত হলেন—একটি গুপ্ত সমিতি স্থাপন করা হল এবং উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপযুক্ত কর্মী সংগ্রহ ও অন্যান্য ব্যবস্থা করতে লাগলেন। পরে ১৯০৫-৬ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করবার জন্যে যে "স্বদেশী আন্দোলন" হয়েছিল, তাতে তাঁদের যথেষ্ট সুবিধা হয়েছিল।

এরই ফলে মাণিকতলা মুরারি পুকুরে বোমার কারখানার উদ্ভব ও বৈপ্লবিক কর্মের প্রসার। এই বোমার কারখানায় বারীন্দ্রনাথ ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত প্রমুখ অনেক বিপ্লবী সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তখন বাংলার বিপ্লবীদের কার্যকলাপে বিদেশী গভর্ণমেন্ট সন্ত্রস্ত হলেন ও শাসনকার্য প্রায় অচল হল। বাংলার সঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশের যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে যতীন্দ্রনাথ ভারত ভ্রমণ করেন। বিশেষতঃ এইজন্যে তিনি পাঞ্জাবে যান এবং সেখানে বিপ্লবীদের এক শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। এই সূত্রেই প্রসিদ্ধ "গদর পার্টির" নাম উল্লেখযোগ্য। "কোমাগাটামারু" খ্যাতির বাবা গুরুদিৎ সিংও যতীন্দ্রনাথের যথেষ্ট সহায়তা করেছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতীয় সৈন্যদলের সহযোগিতা করবার প্ররোচনার জন্যে তিনি প্রথম থেকেই সচেষ্ট ছিলেন।

অনুমান ১৯০৭ খৃঃ যতীন্দ্রনাথ পরমব্রহ্মের সন্ধানে হিমালয় ভ্রমণ করেন ও আলমোড়ায় শ্রীমৎ সোহহং স্বামীর (ঢাকায় বাঘমারা শ্যামাকান্ত) সংস্পর্শে আসেন, আত্মজ্ঞান লাভ করেন এবং গৃহস্থ জীবন ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ও তদবধি স্বামী নিরালম্ব নামে পরিচিত হন। শেষে নিজ জন্মস্থান চান্না গ্রামের বাইরে নির্জন প্রান্তরে, নদীর তীরে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেই স্থানেই শেষে জীবন অতিবাহিত করেন। সুপ্রসিদ্ধ সিদ্ধযোগী ভগবান তিব্বতী বাবার সঙ্গেও নিরালম্ব স্বামীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল।

বিপ্লববাদে তাঁর প্রধান শিষ্য ছিলেন প্রসিদ্ধ বিপ্লবী নেতা ডাক্তার যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়।

যতীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে জনৈক লেখক অভিমত প্রকাশ করেছেন যে "বাংলার নবযুগের সূচনা করেছিলেন দুইজন সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী—

ধর্মক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দ ও কর্মক্ষেত্রে স্বামী নিরালম্ব।" একথা বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি নয়।

লেখকের পরম সৌভাগ্য যে স্বামী নিরালম্বের মত মুক্ত পুরুষের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁকে সেবা করবার এবং আশ্রমে তাঁর সান্নিধ্যে থাকবার সুযোগ হয়েছিল।

শ্রীঅরবিন্দ ও যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বনামখ্যাত ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর প্রণীত "বাংলাদেশের ইতিহাস", চতুর্থ খণ্ড (১৯০৫-১৯৪৭) নামক পুস্তকে বাংলায় বিপ্লববাদের প্রবর্তক যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (স্বামী নিরালম্ব)—যাঁকে বিপ্লবীনেতা যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় 'বাংলার অগ্নিযুগের ব্রহ্মাপ্রপিতামহ' আখ্যা দিয়েছেন—তাঁর কার্য পরিক্রমার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন।

"...বাংলাদেশের বিপ্লববাদ প্রতিষ্ঠায় অরবিন্দের অবদান সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ সাধারণের মধ্যে খুব বেশী প্রচলিত নহে। সুতরাং এ সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন। ১৮৭২ সনে ১৫ই আগষ্ট তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ছিলেন একজন উগ্র সাহেব। সুতরাং তিনি শিশু অরবিন্দকে বাংলা ভাষায় কথা বলিতেও শেখান নাই। আট বছর বয়সেই তাঁহাকে বিলাতে পাঠান। সেখানে তিনি বিলাতী পরিবারে বিলাতী আবহাওয়ায় মানুষ হইবেন, ইহাই ছিল তাঁহার পিতার সঙ্কল্প। অথচ অরবিন্দের পিতা **'Bengalee'** সংবাদ-পত্র হইতে ইংরেজের অত্যাচারের কাহিনী কাটিয়া পুত্রের নিকট পাঠাইতেন এবং চিঠিতে ইংরেজ সরকারকে নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী বলিয়া তীব্র নিন্দা করিতেন। এইগুলি পাঠ করিয়া অতি অল্প বয়স হইতেই অরবিন্দের মনে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ জাগে। তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন এবং 'মজলিস' নামে ভারতীয় ছাত্রবৃন্দের আলোচনা সভায় ভারতে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বহু বক্তৃতা করিতেন। তিনি ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন,

কিন্তু ইংরেজ সরকারের অধীনে জজ-ম্যাজিষ্ট্রেটগিরি করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। এই কারণে উক্ত পরীক্ষার একটি অঙ্গ হিসাবে অশ্বারোহণের পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকায় তাঁহার চাকুরী হইল না। কেহ কেহ বলেন, কেমব্রিজ মজলিসে তাঁহার বিদ্রোহাত্মক বক্তৃতার জন্যই ইংরেজ সরকার এই অজুহাতে চাকুরী দিলেন না। বিলাতে ছাত্র অবস্থায়ই অরবিন্দ Lotus and Dagger নামে এক গুপ্ত বিপ্লবী সমিতির সভ্য ছিলেন। দেশে ফিরিয়া (১৮৯৩ সন) অরবিন্দ বরোদা কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। এই সময়েই তিনি বোম্বাই হইতে প্রকাশিত 'ইন্দু প্রকাশে' কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। বিপ্লববাদের সহিতও তাঁহার কিছু সংস্রব ছিল। কারণ তিনি তাঁহার আত্মজীবনীতে পশ্চিম ভারতে একজন রাজপুত ঠাকুরের নেতৃত্বে গঠিত একটি গুপ্ত সমিতির বিশদ বর্ণনা দিয়াছেন।

এই সময়েই তিনি বাংলায় গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠার কল্পনা করেন। এ বিষয়ে তাঁহার প্রধান সহায় ও পরামর্শদাতা ছিলেন শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি বাঙালী জাতিকে বীর্যবান করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি বরোদায় যাইয়া সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইলেন। তখন বাঙালীর পক্ষে কোন সৈন্যদলে যোগ দেওয়া খুবই কঠিন ছিল। যতীন্দ্রনাথ নিজের উপাধি—"উপাধ্যায়" রূপে পরিবর্তিত করিয়া অবাঙ্গালী পরিচয়ে সৈন্যদলে ভর্তি হইলেন। অরবিন্দ যতীন্দ্রনাথকে বিপ্লবী সমিতি প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলায় পাঠাইলেন। যতীন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসেন ১৯০০ বা ১৯০১ সনে। যতীন্দ্রনাথ কিছুকাল পরে, সম্ভবতঃ পি. মিত্র ও বারীনের সহিত মতভেদ হওয়ার ফলেই, কলিকাতার গুপ্ত সমিতির সংস্রব ত্যাগ করিয়া দেশভ্রমণে বাহির হইলেন। পুলিশ রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, তিনি দার্জিলিং, নেপাল, তিব্বত, বিহার ও উত্তর প্রদেশের বহু স্থানে তিন বছর ঘুরিয়া পেশোয়ার যান (১৯০৭ সন)। পথে পথে সামরিক ছাউনিতে দেশীয় সৈন্যদের সঙ্গে তিনি দেখা করিতেন। পেশোয়ারে পুলিশ সন্দেহ করে তিনি সৈন্যগণকে সরকারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছেন এবং

সরকারী আদেশে তিনি ঐ প্রদেশ ছাড়িয়া আসিতে বাধ্য হন (১৯০৭ সন)। তারপর পাঞ্জাবে তিনি বহু বিপ্লবী নায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ইহাদের মধ্যে লালা লাজপৎ রায়, সর্দার অজিত সিং, লালা আমির চাঁদ, ভগৎ সিংহের পিতা সর্দার কিষণ সিং, লালা হরদয়াল (তখন ছাত্র), লালচাঁদ ফলক (১৯১৫ সনে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী) প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। কেহ কেহ বলেন যে পরবর্তীকালে পাঞ্জাবীরা আমেরিকার যুক্তপ্রদেশে যে বিখ্যাত 'গদর পার্টি' নামে বিপ্লবী সমিতি গঠন করে এবং রাসবিহারী বসু পাঞ্জাবে যে বিপ্লবী দল গড়িয়া তোলেন তাহার বীজ বপন করেন যতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহার সম্বন্ধে বিশেষ কোন প্রমাণ নাই। তবে বাংলা-দেশে তিনি ১৯০৩ সনের পর কোন বিপ্লবী সমিতির সহিত যুক্ত ছিলেন না। পাঞ্জাব হইতে তিনি তাঁহার জন্মভূমি চান্না গ্রামে (বর্ধমান জিলা) ফিরিয়া যান এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সেখানেই আশ্রম স্থাপন করেন। তখন তিনি নিরালম্ব স্বামী নামে পরিচিত হন।

অনেকের মতে "যতীন্দ্রনাথ বাংলায় বিপ্লবী ভাবধারা বহন করে এসে কলিকাতায় সর্বপ্রথম বিপ্লবী সঙ্ঘ গড়ে তুলেছিলেন···"।

অনুশীলন সমিতির উৎপত্তি ও প্রসার

প্রবীণ বিপ্লবী শ্রীকালীচরণ ঘোষ মহাশয় কর্তৃক লিখিত "জাগরণ ও বিস্ফোরণ" নামক গ্রন্থ হতে সংকলিত। (১ম খণ্ড পৃঃ ১০৯—১১১) এই গ্রন্থখানি বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবের পূর্বাপর ইতিবৃত্ত।

···বঙ্গ-বিভাগ যখন হল, তখন দেশে বেশ কয়েকটি 'দল' তৈরী হয়েছে। এদের মধ্যে 'অনুশীলন সমিতি' সর্বশ্রেষ্ঠ। স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ব থেকে ইংরেজ সম্পর্ক চিরতরে ছিন্ন হওয়া পর্যন্ত নানা দলে 'অনুশীলন সমিতি' সংগ্রাম চালিয়ে গেছে। মূল স্রোত থেকে অনেক শাখানদী বেরিয়েছে, যেমন—শক্তিশালী 'যুগান্তর পার্টি'। কিন্তু আপন স্রোতের ধারা কখনও মাঝপথে নিঃশেষ হয়ে যায় নি।



পুলিনবিহারী দাস

আনুষ্ঠানিকভাবে কলকাতায় ১৯০২ সালে স্থাপিত হলেও, তার বৎসরখানেক আগে সতীশচন্দ্র বসু কলেজে ছাত্রাবস্থায় ব্যায়াম, পাঠ, চরিত্র গঠন প্রভৃতি লক্ষ্য করে কয়েকজন যুবক নিয়ে কাজ আরম্ভ করেন। তিনি একাজে কলেজের (General Assembly's Institution) কোনও কোনও অধ্যাপকের সহায়তা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যখন বেশ গড়ে উঠেছে, তখন মদন মিত্র লেনে আখড়া স্থাপন করেন। পি. মিত্র এই প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে অবগত হলে, সতীশচন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং 'অনুশীলন সমিতি' পূর্ণোদ্যমে কাজ আরম্ভ করে।

প্রাথমিক কর্মীদের মধ্যে এমন অনেকেই ছিলেন, যাঁরা উত্তরকালে 'যুগান্তর' দলের প্রতিষ্ঠাবান নেতা বলে পরিচিত হয়েছেন।

'অনুশীলন সমিতি'র বড় করে পরিচয় হয়, তার ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত শাখার সাহায্যে। ১৯০৫ সালে পি. মিত্র ও বিপিনচন্দ্র পাল পূর্ববঙ্গে সফরে গেলে, ঢাকার কর্মীদের সঙ্গে পরিচিত হন এবং একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় (৩রা মার্চ, ১৯০৫)। উত্তরকালে প্রচুর খ্যাতিমান পুলিন দাস এই সমিতি পরিচালনা করে এক নব উন্মাদনা সৃষ্টি করতে সমর্থ হন। নানা স্থানে শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এক সময় তার সংখ্যা পাঁচ-শয়েরও বেশী হয়েছিল।

তার একটু আগের কথার উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। যতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে নিরালম্ব স্বামী) কলিকাতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে (১৯০১) একটি "আখড়া" প্রতিষ্ঠা করেন আপার সারকুলার রোড (আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড) ও সুকিয়া ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলের কাছাকাছি। সেখানেই প্রথম লাঠি, ছোরা, তলোয়ার খেলা, ড্রিল, ঘোড়ায় চড়া, কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ, সাঁতার প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। পি. মিত্র মহাশয়কে এ সংবাদ জানিয়ে রাখা হয়। প্রথম দিকে তাঁর নিকট কোনও যুবক এ সকল বিষয় শিক্ষার সন্ধানে এলে তিনি, "বরোদা থেকে যারা এসে আখড়া স্থাপন করেছে", তাদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন।

প্রতিষ্ঠার সময় সমিতির সভ্যতালিকাভুক্ত ছিলেন সুরেন্দ্র হালদার, চিত্তরঞ্জন দাশ, রজত রায় এবং ডি. বসু প্রভৃতি তৎকালীন খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ। দুটি সংস্থা একযোগে কাজ করাতে এবং যশ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ায় ক্রমে যুবকের দল এসে যোগ দিতে আরম্ভ করে স্বল্প-কালের মধ্যে 'অনুশীলন সমিতি'—এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের শীর্ষস্থান অধিকার করতে সমর্থ হয়।

যতদূর বলা হয়েছে তা থেকে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, অনুশীলন সমিতি ঐ সময় একাই সবাইকে চাপা দিয়ে ফেলেছিল। যারা স্বল্পকাল পরেই 'যুগান্তর দল' বলে পরিচয় লাভ করে, তারা সকলেই এই অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিল। এখানে বলে রাখা চলে যে, 'যুগান্তর' স্বতন্ত্রভাবে পরিচালিত হবার পরে মফঃস্বলের অপরাপর প্রতিষ্ঠানগুলি মোটামুটি এই দুই দলের সঙ্গে যুক্ত হয়।

যুগান্তর দল (পুলিশের খাতায় "পার্টি") নিতান্ত স্বতন্ত্রভাবে উদ্ভূত হয়নি। যখন অবস্থা বেশ গুরুতর আকার ধারণ করেছে তখন কেন্দ্রীয় বৈপ্লবিক সংস্থার সভাপতি ছিলেন পি. মিত্র, সহ-সভাপতি অরবিন্দ ঘোষ ও চিত্তরঞ্জন দাশ, কোষাধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

যতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তারপরে বারীন ও তাঁর সঙ্গীরা অনুশীলন সমিতির সভ্য বলেই পরিচিত। কিন্তু কার্যক্রম নিয়ে একটু মতভেদ হয়।

বাংলার অগ্নিযুগের কয়েকটি সমিতি ও সংস্থার তালিকা

নাম, ঠিকানা, প্রতিষ্ঠার বৎসর (কয়েকজন প্রতিষ্ঠাতা, পৃষ্ঠপোষক ও বিশিষ্ট সভ্য)

১। আত্মোন্নতি (১৮৯৭) ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা
বিপিনচন্দ্র গাঙ্গুলী
গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রভাসচন্দ্র দেব
অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

২। সুহৃদ সম্মিলনী (১৯০১) মৈমনসিংহ
ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

৩। ফ্রেণ্ডস ইউনাইটেড ক্লাব (১৯০২) কলিকাতা
রাধিকামোহন রায়

৪। অনুশীলন সমিতি (১৯০২) কলিকাতা
সতীশচন্দ্র বসু
যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়
পুলিনবিহারী মুখার্জী
যতীন্দ্রনাথ শেঠ

৫। ডন সোসাইটি (১৯০২) কলিকাতা
সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

৬। বান্ধব সম্মিলনী (১৯০২) গোন্দল পাড়া, চন্দননগর
বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীশচন্দ্র ঘোষ
অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ
হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল

৭। স্বাস্থ্যকেন্দ্র (১৯০৪) চিংড়িপোতা, ২৪ পরগণা
চিংড়িপোতা গ্রুপ (হরিনাভি)
হরিকুমার চক্রবর্তী

সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (এম. এন. রায়)
শৈলেন্দ্রনাথ বসু
ভূষণ মিত্র
কালীচরণ ঘোষ

৮। ছাত্র ভাণ্ডার (১৯০২) কলিকাতা
ইন্দ্রনাথ নন্দী
নিখিলেশ্বর রায় মৌলিক

৯। অনুশীলন সমিতি (১৯০৫) ঢাকা
পি. মিত্র, পুলিনবিহারী দাস

১০। মুক্তি সংঘ (১৯০৫) ঢাকা
হেমচন্দ্র ঘোষ
পরে Bengal Volunteers নামে খ্যাত

১১। স্বদেশ বান্ধব সমিতি (১৯০৫) বরিশাল
অশ্বিনীকুমার দত্ত
সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
উপেন্দ্রনাথ সেন (জমিদার)

১২। স্বদেশ সেবক সমিতি (১৯০৭) কলিকাতা
ললিতমোহন ঘোষাল

১৩। শক্তি সমিতি (১৯০৭) রাণাঘাট, নদীয়া

১৪। যুবক সমিতি (১৯০৮) কলিকাতা

১৫। ব্রতী সমিতি (১৯০৮) ফরিদপুর
অম্বিকাচরণ মজুমদার
কৃষ্ণকুমার মিত্র
মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা

বিপ্লবী নেতা যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সম্বর্ধনা

(বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও লেখক জীবনতারা হালদারের শ্রদ্ধাঞ্জলি।)

বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু অনুশীলন সমিতির একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন এবং বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টার সহিত তাঁহার সংযোগ ছিল—একথা হয়তো সুবিদিত নয়। সেই তথ্য প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সত্যেন্দ্রনাথ আমার বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী—অন্তরঙ্গ, অভিন্নহৃদয়। ১৯০৫ সাল থেকেই দুজনেই সমিতির সভ্য। এই প্রসিদ্ধ সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত নানাবিধ গঠনমূলক কাজের সঙ্গে আমরা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থেকে ভবিষ্যৎ জীবনে নানা রকমে উপকৃত হয়েছি।

যৌবনকালে অনুশীলন সমিতির সভ্য হিসাবে আমরা তৎকালীন বিপ্লব-প্রচেষ্টার সঙ্গেও অল্প-বিস্তার যুক্ত হই এবং কয়েকজন খ্যাতনামা বিপ্লবী নেতার সংস্পর্শে আসি। তার মধ্যে সর্বপ্রধান ডাক্তার যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়। তাঁর ব্যক্তিত্ব অসাধারণ। সত্যেনদা ও আমি উভয়েই যাদুগোপালবাবুর স্নেহভাজন হই। তাঁর সান্নিধ্যে এসে, তাঁর সাহচর্য পেয়ে, আমরা ধন্য হয়েছি।

আমরা যে একত্রে যাদুগোপালবাবুর অনুগত ছিলাম, সে সম্বন্ধে একটি প্রামাণ্য দলিল আছে। ১৯৬৬ সালে যাদুগোপালবাবুর কয়েকজন 'নবীন গুণমুগ্ধ অনুরাগীদল' তাঁর ৮০ বছর বয়স পূর্তি উপলক্ষে তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের আয়োজন করেন। সেই উদ্দেশ্যে একখানি অভিনন্দন-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

উদ্যোক্তারা সেই গ্রন্থে কিছু লেখা দেবার জন্য সত্যেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেন এবং আমার উপর সেটা সংগ্রহ করবার ভার দেন। তিনি নিজেই লেখাটা শেষ করলেন, আমাকে পড়ে শোনালেন এবং নিজে সই করে আমাকেও সই করতে বললেন—'যেহেতু আমরা দুজনে এক সঙ্গে কাজ করেছি'।

এইরূপে আমাদের যুগ্মনামে যাদুদার উদ্দেশ্যে আমাদের যে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রকাশিত হলো, নিচে তার উদ্ধৃতি দিলাম।

যাদুদা

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু (কলকাতা)

শ্রীজীবনতারা হালদার (কলকাতা)

'যাদুদার আশি বছর পূর্ণ হতে চললো। আমরা যখন তাঁর কথা শুনেছি তখন নিজেরা স্কুলের ছাত্র। স্বদেশীর যুগ। কলিকাতার পাড়ায় পাড়ায় অনুশীলন সমিতির শাখার ছেলেরা ব্যায়াম করছে, লাঠি খেলছে। আবার যখন কোন বড় আয়োজন হতো, সব শাখা থেকে নবীন সভ্যেরা ৪৯, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের সংলগ্ন মাঠে হাজির হতো, প্রশংসমান চক্ষে দেখতো লাঠি, ছোরা, গদা খেলা। মনে পড়েছে, যাদুদা তখন সব্যসাচীর মত দুই হাতে হাতিয়ার চালাতে পারতেন বলে খ্যাতি ছিল।

পরে আমরা একটু বেশী বয়সে তাঁর সাহচর্য পেয়েছি। যখন তাঁর সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ হলো, তখন তাঁর অমায়িক ও স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছি। সদা হাসিখুশী মুখ, বিপদে ঘাবড়ান না—তবে আমাদের থেকে একটু দূরে থাকতেন। তার অন্তরঙ্গ ছিলেন শরৎ ঘোষ, যতীন শেঠ, লাড্‌লী মিত্র।

অনুশীলন সমিতির অনেক কাজে যাদুদাকে দেখতাম এবং পরে যখন সমিতি বে-আইনী ঘোষিত হলো, তখন যোগসূত্র হয়েছিল অনেক ক্ষীণ। প্রথম মহাযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে তিনি গা ঢাকা দিলেন। যাদুদা এখন অনেক গল্পকথার নায়ক। তাঁর ভাই ধনগোপাল আমেরিকা থেকে 'My Brother's Face' লিখে সেই যুগের নিস্পৃহ আত্মত্যাগী স্বদেশী কর্মীর সঙ্গে লোকের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

শুনেছি প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যে বন্ধুরা যখন দেশ-বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র এনে বাঘা যতীনের নেতৃত্বে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা তোলবার চেষ্টা করেছিল, তখন যাদুদাও তাতে একটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সে কাহিনী এখনও অনেকাংশে অজ্ঞাত রয়ে গিয়েছে।

বিদ্রোহীদের প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হলো। অনেকে অন্তরীণ হলেন। অনেক দিন পর্যন্ত যাদুদার বাংলায় আসা নিষিদ্ধ ছিল।

দুঃখকষ্ট বাধা-বিপত্তি মাথায় করে যাদুদা হাসিমুখে ৮০ বছর কাটিয়ে দিলেন। পরিণত বয়সে দেখেছি রাঁচিতে তিনি একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ চিকিৎসক।

দেশনায়ক থেকে আরম্ভ করে সাধারণ লোক পর্যন্ত তার পরামর্শ ও ব্যবস্থার জন্যে লালায়িত। সারা দেশ তাঁর সুখ্যাতিতে ভরপুর।'

এই অভিনন্দনপত্রে কয়েকটি জিনিষ লক্ষণীয়। প্রথমেই শিরোনামা 'যাদুদা'। এই থেকেই বোঝা যাবে, কতটা অন্তরঙ্গতা ও ঘনিষ্ঠতা থাকলে এইরূপ সম্বোধন সম্ভব।

তারপর সত্যেন্দ্রনাথ যাদুদার সম্বন্ধে যে সব বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন, তার প্রত্যেকটি সত্যেন্দ্রনাথের নিজের সম্বন্ধে প্রযোজ্য। অল্প পরিসরে অর্থপূর্ণ কথায় সত্যেন্দ্রনাথ যাদুদার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, কর্মকুশলতা, বিচক্ষণতা, মানবিক মূল্যবোধ; জ্বলন্ত দেশপ্রেম প্রভৃতি সহজ গুণগুলি ফুটিয়ে তুলেছেন।

বলা বাহুল্য এই আদর্শেই সত্যেন্দ্রনাথ মানুষ হয়েছেন। বাল্যে ও যৌবনে সত্যেন্দ্রনাথের উপর অনুশীলন সমিতির যে প্রভাব পড়েছে, পরবর্তী জীবনে সেগুলিই তার চরিত্রে পরিস্ফুট হয়েছে। অনুশীলন সমিতি সবাঙ্গসুন্দর মানুষ তৈরীর যে ভার নিয়েছিল তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ সত্যেন্দ্রনাথ।

সেই প্রেরণায় সত্যেন্দ্রনাথ আজীবন দেশ ও জাতির সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন এবং সাফল্য লাভ করে দেশবরেণ্য হয়েছেন ও বিশ্বখ্যাতি লাভ করেছেন। অনুশীলন সমিতির, তথা যাদুদার, অন্যতম motto ছিল—Love all, hate none.—এটিই সত্যেন্দ্রনাথের বিশ্বপ্রেম ও মানবিকতার মূল উৎস। এতেই তাঁর পূর্ণতা, তাঁর মহত্ত্বের বিকাশ।

বস্তুতঃ সত্যেন্দ্রনাথের ৭০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে যখন সম্বর্ধনার আয়োজন হয়েছিল তখন যাদুদা আমায় লিখেছিলেন—'জীবনতারা, এখন বুঝতে পেরেছো অনুশীলন সমিতি কি রকম মানুষ তৈরী করতে চেয়েছিল—তা সত্যেনকে দেখলেই বোঝা যাবে।'

১৬ই আগষ্ট, ১৯৭৪ প্রবীণ বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ শেঠ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৬ বৎসর। যৌবনকালে তিনি অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন। অগ্নিযুগে বিপ্লব প্রচেষ্টার সঙ্গে নানাভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। খ্যাতনামা বিপ্লবী নেতা যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা করেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর ভ্রাতাদের অবদানও স্মরণীয়। সকলেই অন্তরীণ ও কারাদণ্ড ভোগ করেছেন।

কলকাতা ৭৮নং বিডন ষ্ট্রীটস্থ তাঁহাদের পৈত্রিক বাসগৃহ বিপ্লবীদের গুপ্ত কেন্দ্র ছিল। এই সূত্রে সমগ্র পরিবারকেই অশেষ নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। দ্বারদেশে প্রস্তর ফলকে তার উল্লেখ আছে। বহু স্বাধীনতার ইতিহাস গ্রন্থেও এ কথার স্বীকৃতি আছে।

তাঁর অন্যান্য সহকর্মীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অরুণ গুহ, ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত, নগেন্দ্রশেখর চক্রবর্তী, জিতেন লাহিড়ী, বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রভৃতি।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে যাদবপুর জাতীয় শিক্ষা পরিষদ উদ্বোধনের দিন শ্রীঅরবিন্দের নিকট প্রথম ছাত্র হিসাবে তালিকাভুক্ত হবার বৈশিষ্ট্য যতীন্দ্রনাথের। আমেরিকায় সুপ্রসিদ্ধ হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় স্নাতক হবার কৃতিত্বও তাঁহার।

আমার অনুশীলন সমিতির ইতিহাস পুস্তক সম্বন্ধে যাদুদার আশীর্বাদ

স্নেহের জীবনতারা, রাঁচি ২।৪।৫৩

তোমার প্রেরিত দু-কপি অনুশীলন সমিতির ইতিহাস পেয়েছি। পড়ে দেখলাম। স্বল্প পরিসরে সুন্দর লেখা হয়েছে। সমিতি যে মানুষ তৈরী করতে চেয়েছিল এবং আজ আবার সমিতির কাজ আরম্ভ হওয়া ও দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়া প্রয়োজন—একথা খুব সময়োপযোগী। ভগবান করুন তুমি সুস্থ ও সবল থাকো। মধ্যে মধ্যে এই রকম লেখা লিখো।

ইতি—**যাদুদা**

চিরঞ্জীবেষু জীবনতারা, ২৯।৫।৬৬

তোমার লেখা অনুশীলন সমিতির ইতিহাস ৩য় সংস্করণ—is a masterpiece. এত সুন্দর হয়েছে যে বলে শেষ করা যায় না। রবি ঠাকুরের সঙ্গে যতীনের সাক্ষাৎকার খুব মূল্যবান। আমি জানতাম না যে রথীনবাবু সমিতির সভ্য ছিলেন। তুমি যথার্থ Research scholar.

ইতি—**যাদুদা**

আমেরিকা নিবাসী প্রতিথযশা বিপ্লবী ডঃ তারকনাথ দাস ১৯৫২ সালে একবার ভারতে আসেন—স্বাধীনতা লাভের পর মাতৃভূমির প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার উদ্দেশ্যে—৪৭ বৎসর প্রবাসের পর। তখন যাদুদার নির্দেশে অনুশীলন সমিতির পক্ষ থেকে তাঁহাকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য কলকাতায়

একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়—ইং ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫২। এর সমস্ত আয়োজনের ভার আমার উপর ন্যস্ত ছিল। সংবাদপত্রে তার বিবরণ পাঠ করে যাদুদা লেখেন—

স্নেহাশীষ জীবনতারা, রাঁচি ১২-৯-৫২

সাবাস, তোমায় দুশো সাবাস। তুমি একাই একশ। চমৎকার কাজ সফল করে তুলেছ। একার খাটুনি কত শক্তিশালী তা তুমি যথার্থ দেখালে। আমি খবরের কাগজে রিপোর্টগুলি দেখেছি। সুন্দর, সব সুন্দর। তোমার দীর্ঘজীবন কামনা করি ও কর্মশক্তি যেন তোমার অটুট থাকে। তুমি আমাদের গৌরব।

ইতি—যাদুদা

যুগান্তর দল ও নেতৃত্ব

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত

(প্রবীণ বিপ্লবী নেতা যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের ৮০ বৎসর বয়স পূর্তি উপলক্ষ্যে তাঁর কয়েকজন "নবীন গুণমুগ্ধ অনুরাগী" দল কর্তৃক প্রকাশিত "জয়ন্তী উৎসর্গ" পুস্তক।)

বারীনবাবুর সময়ে 'যুগান্তর' ছিল তাঁদের সাপ্তাহিক পত্রিকার নাম। সেই দিনে যুগান্তর কোন দলের নাম ছিল না। যাঁরা যুগান্তর পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন কলিকাতা অনুশীলন সমিতির সভ্য। যুগান্তর দলের নেতৃস্থানীয় বলে যাঁদের আমরা জানি—যেমন যাদুগোপাল মুখার্জী, মানবেন্দ্রনাথ রায়, অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, হরিকুমার চক্রবর্তী প্রভৃতি, এঁরা সকলেই কলিকাতা অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন। ৺যতীন মুখার্জী ও বারীনবাবু দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তিনি অনুশীলন সমিতিতেও ছিলেন না, যদিও উভয় দলের সঙ্গেই তাঁর সংস্রব ছিল। অতএব যুগান্তর দলের লোক বলে যাঁদের বলা হয়, তাঁরা যে যুগান্তর পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরই নব-সংগঠন, একথা বলা চলে না। বারীনবাবু ও তাঁর সঙ্গী-সাথীরা জেলে চলে যাওয়ার পরে তাঁদের দলটা সম্পূর্ণভাবেই ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। সেই দলের বাকী যাঁরা ছিলেন, তাঁরা আর কখনো নূতন করে দল গড়ার চেষ্টা করেননি।

প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের সময়ে জার্মানদের সহায়তায় যতীন্দ্রনাথ মুখার্জীর নেতৃত্বে

গঠিত একটি দল দেশব্যাপী এক বিদ্রোহ সৃষ্টির আয়োজন করেছিল। তখন তারা বাংলা দেশের সবগুলি বিপ্লবী দলকে এক সংগঠনের ভিতরে আনবার চেষ্টা করেছিল। ঢাকার অনুশীলন সমিতি ও কলিকাতার বিপিন গাঙ্গুলী মহাশয়ের দল ছাড়া বাংলা দেশের অন্যান্য দল তাদের সে ডাকে সাড়া দিয়ে মোটামুটি এক সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। ঢাকা অনুশীলন ও বিপিনবাবুর দলও অবশ্য পুরোপুরি সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু এই দুটি দল ছাড়া অন্যান্য দলগুলি বহুদিন একযোগে এবং এক নেতৃত্বে কাজ করার ফলে এইসব দলের মধ্যে এমন একটা একতা ও একপ্রাণতার সৃষ্টি হয়েছিল যে ভবিষ্যতে এরা এক দলের অন্তর্ভুক্ত বলে নিজদিগকে মনে করতে কোনো অসুবিধা অনুভব করেনি। যারা এক সংগঠনের মধ্যে এসে মিলেছিল, তারা কারা ?

এক কথায় বলা যায় যে, ১৯১৫ সালের প্রথম দিকে বরিশালের দলের সঙ্গে যতীন মুখার্জীর দলের যোগ স্থাপিত হওয়ায়, পূর্বে উল্লেখিত দুটি দল ছাড়া বাংলা দেশের বাকী দলগুলি—যারা তখন কার্যক্ষেত্রে সক্রিয় ছিল—তারা সকলেই এক সংগঠনের মধ্যে এসে গেল। বরিশাল দলের নিজস্ব শাখা সংগঠন ছিল—নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ফরিদপুর, শ্রীহট্ট প্রভৃতি জেলায়। তারপরে ময়মনসিংহের মণি চৌধুরী ও ক্ষিতিশ চৌধুরীর আগ্রহে ও চেষ্টার ১৯১৪ সালে বরিশাল দলের নরেন ঘোষচৌধুরী ও সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ময়মনসিংহে চলে গিয়ে সাধনা সমিতির সর্বপ্রধান নেতা হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে উভয় দলের মিলে মিশে এক হয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এরপর থেকে উভয় দল কার্যতঃ ও প্রত্যক্ষতঃ এক হয়ে চলতে থাকে। আর ১৯১৪ সালেই হাইকোর্টের উকিল এবং ভূতপূর্ব মুনসেফ্ অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের চেষ্টায় ও আগ্রহে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত যতীন রায় মহাশয়ের দলের সঙ্গে বরিশাল দলের প্রায় এক সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়ার মতো ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। এ ছাড়া ফরিদপুরের পূর্ণচন্দ্র দাস মহাশয়ের দল বরিশাল দলের পূর্বে যতীন মুখার্জীর দলের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল।

এই মিলিত দলের নেতা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন কার্যতঃ যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী, যদিও তাঁকে কেউ ভোট দিয়ে নেতা বানায়নি। এই মিলিত দল কতকগুলি উপদলের সমষ্টি, যাদের নিজস্ব পৃথক্ পৃথক্ ইতিহাস আছে, ঐতিহ্য আছে—

পৃথক্ পৃথক্ নেতৃত্ব ও শাসন-শৃঙ্খলা আছে। কিন্তু বৃহত্তর প্রয়োজনে তারা একযোগে কাজ করে একসূত্রে গ্রথিত হয়েছে। এই উপদলগুলি হচ্ছে—(১) বরিশাল, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, শ্রীহট্ট জেলার শাখা সংগঠন নিয়ে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী ও নরেন ঘোষচৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত বরিশাল দল, (২) ময়মনসিংহের হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, আনন্দ রায়, মনি রায় ক্ষিতিশ চৌধুরী, নরেশ চৌধুরী প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের দ্বারা পরিচালিত সাধনা সমিতির দল, (৩) উত্তরবঙ্গের যতীন রায়, যোগেশ দে সরকার, কালী বাগচী, বাদল দাসগুপ্ত প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের দ্বারা পরিচালিত যতীন রায় মহাশয়ের দল, (৪) ফরিদপুরের পূর্ণচন্দ্র দাস, চিত্তপ্রিয় রায়, মনোরঞ্জন সেন, নীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের দ্বারা পরিচালিত পূর্ণদাস মহাশয়ের দল, (৫) ইদিলপুরের নিখিল গুহ রায়ের দল এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ছড়ানো যতীন মুখার্জী, যাদুগোপাল মুখার্জী, নরেন ভট্টাচার্য (মানবেন্দ্রনাথ রায়), অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, হরিকুমার চক্রবর্তী, সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের দ্বারা পরিচালিত যতীন মুখার্জী মহাশয়ের দল। এক সময়ে ঢাকার হেম ঘোষ মহাশয়ের দল ও চট্টগ্রামের সূর্য সেন মহাশয়ের দল যোগ দিয়েছিল। কিন্তু সে অনেক পরের কথা।

অজ্ঞাতবাসের ছয় বছর

শ্রীনলিনীকান্ত কর

তদানীন্তন ব্রিটিশ রাজপুরুষদের অজ্ঞাতসারে বিপ্লব পরিচালনার প্রয়োজনে বিপ্লবী নেতা যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়কে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ছয় বছর বিচরণ করতে হয়েছিল। নানারূপ ছদ্মবেশে, নানা স্থানে, নানা পরিবেশে।

যাদুগোপালবাবুর ৮০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে তাঁহার "নবীন গুণমুগ্ধ অনুরাগী" দল কর্তৃক প্রকাশিত (১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬ খৃঃ) "জয়ন্তী উৎসর্গ" পুস্তকে তাঁহার বিশ্বস্ত সাথী বিপ্লবী নলিনীকান্ত কর এই অসাধারণ আত্মগোপনের মনোরম বিবরণ দিয়াছেন। নিম্নে কেবলমাত্র ভূমিকাটি উদ্ধৃত হইল।—(অন্যান্য লেখকদের মধ্যে আছেন সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, সুধাংশুকিশোর আচার্য।)

লক্ষণীয় যে অজ্ঞাতবাসের এই ছয় বৎসরের বিবরণ যাদুগোপালবাবুর নিজের

লেখা "বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি গ্রন্থেও" প্রকাশ করেননি। উহ্য রেখেছেন। সেই হিসাবে নলিনীবাবুর এই লেখাটি অতিশয় মূল্যবান। একটি শূন্যস্থান পূর্ণ করিল। নচেৎ অজ্ঞাতই থাকিয়া যাইত।

"শ্রদ্ধেয় যাদুদার সহিত আমার পরিচয় ঘটে ১৯০৮ সালে, উনপঞ্চাশ নম্বর কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটস্থ অনুশীলন সমিতির বাড়ীতে। সমিতির খেলার মাঠে, সন্ধ্যার দিকে তাঁকে প্রায়ই দেখতাম। ছিপ্‌ছিপে লম্বা, পেশীবহুল, ঋজু দেহ, দৃঢ় পদক্ষেপ, বিরল সংযত-শান্ত কথা, স্বচ্ছ সতেজ মুখশ্রী। পরণে ধুতি, খোঁট কোমরে গেরো দিয়ে বাঁধা। গায়ে সাদা পাঞ্জাবী। মনে হয় গলায় একটা চাদর পাকিয়ে জড়ানো থাকতো। যতদূর মনে পড়ে, তিনি তখন ডাফ কলেজে এফ. এ. পড়তেন। তিনি মাঠে আসামাত্র ছোট লাঠিখেলার শিক্ষার্থীরা তাঁকে ঘিরে দাঁড়াত, লাঠির প্যাঁচ দেখিয়ে দেবার জন্য। দু-চারটা প্যাঁচ দেখিয়ে দিয়েই চলে যেতেন। অন্যের মত কোন গল্পগুজবে যোগ দিতেন না। তবে মাঝে মাঝে ভোলানাথ চ্যাটার্জীকে একান্তে নিয়ে গিয়ে সামান্য ক্ষণ কথাবার্তা কয়েই চ'লে যেতেন। তাঁকে একটু গম্ভীর প্রকৃতির ব'লে মনে হতো। আমি দেশেতেই ছোট লাঠিখেলা শিখেছিলাম, সেজন্য ছোট লাঠিখেলা আমাকে তেমন আকৃষ্ট করতে পারেনি। আমি তখন শারীরিক শক্তি-সাধনাতেই অধিক ব্যস্ত। কুস্তি, ডন-বৈঠক, রিং, বার্বেল উত্তোলন, টাগ-অব-ওয়ার ইত্যাদির দিকেই বেশী ঝোঁক।

যাদুদা খুব সাবধানী পথিক ছিলেন। তিনি নিজেকে ধরাছোঁয়ার বাইরে রাখতেন। কারণ, অনুশীলন সমিতির কিছু সভ্য মিলে একটা রাজনৈতিক চক্র গঠিত হয়েছিল। সেই চক্রের সভ্য ছিলেন শ্রদ্ধেয় লাড্‌লি মিত্র, সুধীর রায়চৌধুরী, জ্ঞান মিত্র, যতীন শেঠ, হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল, আমি, আরো তিন-চারজন—তাদের নাম মনে পড়ছে না। এই চক্রের বৈঠকে পাইনি—আরো একজন গোপনচারী ছিলেন। তিনি হচ্ছেন শ্রদ্ধেয় সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়, কলিকাতা সেন্ট্রাল কলিজিয়েট স্কুলের হেড মাস্টার। শুনেছিলাম তাঁর উপদেশ অনুযায়ী এই চক্র গঠিত হয়েছিল, অথচ তাঁকে কোনদিন এই চক্রে যোগ দিতে দেখিনি।

* * *

যাদুদাকে খুব কাছে পেলাম ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। তখন তিনি দাদার (যতীন মুখার্জী) বিপ্লবের প্রচেষ্টায় দক্ষিণ-হস্ত হয়ে কাজ করছেন।

দেখে বড়ই আনন্দ পেলাম। তিনি ছিলেন বৈদেশিক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক, আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিশেষজ্ঞ। অতুল ঘোষ ও নরেন ভট্টাচার্য (পরে এম. এন. রায়) ছিলেন আভ্যন্তরিক বিপ্লব প্রচেষ্টার অধিনায়ক। যাদুদা স্বাধীনতা সংগ্রামে দাদার সাথে হাত মিলিয়ে কাজ ক'রে যাচ্ছিলেন সত্য, কিন্তু একেবারে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন নি। তাঁর নিজস্ব কতকগুলি পরিকল্পনা স্থির ছিল। বিপ্লবকে সফলতার পথে নিয়ে যেতে হ'লে তাঁর সেই পরিকল্পনাগুলি আগে সমাধা হওয়া দরকার। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ভোলানাথ চ্যাটার্জীকে পাঠিয়েছিলেন সিঙ্গাপুরে, আর তাঁর ছোট ভাই ধনগোপাল মুখার্জীকে পাঠিয়েছিলেন জাপানে। হঠাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ লেগে গেল। এই যুদ্ধের সুযোগ নেবার উদ্দেশ্যে মহান বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বোস পাঞ্জাবে সিপাহীদের মধ্যে ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার প্রেরণা জাগিয়ে তুলেছিলেন। লাহোর, রাউলপিণ্ডি ও মীরাটে একসঙ্গে ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীতে বিদ্রোহ ঘোষণা করবার সমস্ত ঠিক হয়েছিল। ঐ সময়ে বাংলাতেও দশম জাঠ সিপাহীদের ঠিক করা হয়েছিল বিদ্রোহ ঘোষণা করবার জন্য। দশম জাঠ সেনা সম্প্রতি অন্যস্থান হ'তে বদলি হ'য়ে কলিকাতায় এসেছিল। বাংলার সর্বদল (ঢাকার 'অনুশীলন' ছাড়া) সম্মতি-ক্রমে মহান পুরুষ যতীন্দ্রনাথ মুখার্জীকে বাংলার বিপ্লব ও বিদ্রোহ পরিচালনায় নেতৃত্বে বরণ করা হলো। এই বিপ্লব ও বিদ্রোহ পরিচালনায় প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। ডাকাতির দ্বারা অর্থসংগ্রহ ছাড়া তখন অন্য উপায় ছিলো না। বাধ্য হয়ে ডাকাতির দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করার অনুমতি দিলেন। প্রথমেই গার্ডেনরিচের মোটর ডাকাতি নরেনদার নেতৃত্বে সাধিত হয়। তাতে র‍্যালি-ব্রাদার্সের আঠার হাজার টাকা লুট হয়। ডাকাতির পরে নরেনদার কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। দাদা ব্যস্ত হয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে যাদুদার বেনিয়া-টোলার বাড়ীতে গিয়ে হাজির। সেদিন যাদুদা প্যাথোলজির ফাইন্যাল পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, আর সব বিষয় ইতিপূর্বেই শেষ হয়েছে।

দাদা যাদুদাকে বললেন, "যাদু, নরেনের কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না—তার খোঁজ করতে তোমাকে না বেরুলে চলছে না।" যাদুদা দ্বিরুক্তি না ক'রে তখনই বেরিয়ে পড়লেন। প্যাথোলজির পরীক্ষা প'ড়ে রইল। সেই-যে ঘর ছেড়ে বের হলেন—ঘরে ফিরলেন পূর্ণ ছ'বছর পরে, ১৯২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে।

পুলিশ রিপোর্টে লেখকের পরিচিতি

বলা বাহুল্য বিপ্লবের যুগে ব্রিটিশ সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের গুপ্তচরেরা প্রত্যেক বিপ্লবীদল ও দলের সভ্যদের, এমন কি সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের, সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করিত এবং তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিত।

এইরূপ একটি তালিকার নাম Green Register।

পুলিশ বিবরণের একটি নমুনা নীচে মুদ্রিত হইল। প্রসঙ্গতঃ ইহা লেখকের পরিচিতি হিসাবে গণ্য হইবে। তারিখের ২টি ভুল সংশোধন করা হইল।

(Confidential Report from Police Register,

C. I. D., Special Branch, Calcutta.)

Green List

Serial No. 1095

Jibantara Haldar

S/o. Ratan Lal
of 22/1/1, Jeliatola
Street, Calcutta.

Year of Brith : 1893

Member of the Western Bengal Party under Atul Ghosh. Started an Akhara & Ghee shop, both of which were used as rendezvous for revolutionists. He also advanced a large sum of money to start another rendezvous in Chittagong.

A diary which he kept shows that he was in communication with members of the Indo German conspiracy and of the organisation in the United Provinces. He appears to have been a dangerous person.

Interned : 2-12-16 & 31-5-17 Released : 17-11-17

পুলিশের ২টি কুখ্যাত অফিস (I. B. ও C. I. D.) ছিল—৩নং কিড ষ্ট্রীট ও ১০নং ইলিসিয়ম রো, চৌরঙ্গী, কলিকাতা। বহু বিপ্লবীকে গ্রেপ্তারের পর এই দুই অফিসে যেতে হয়েছিল।

রিপোর্টের ব্যাখ্যা

(১) আখড়া—তখনকার দিনে সব সমিতিকেই পুলিশ 'আখড়া' নাম দিয়েছিল। লেখকের বসতবাটীর পিছনের মাঠে।

(২) ঘিয়ের দোকান—আমাদের বসতবাটির রাস্তার ধারের ঘরে ২/৩ বছর চলেছিল। বিপ্লবী অমর ঘোষের দাদা উত্তর ভারতের নানা স্থান হইতে পাইকারী দরে ঘি পাঠাতেন, এই দোকানে খুচরা বিক্রয় হত। প্রকৃতপক্ষে উহা বিপ্লবীদের সংবাদ আদান প্রদানের মাধ্যম ছিল।

(৩) বিপ্লবী সতীর্থ নলিনচন্দ্র চৌধুরীকে (দোলনা ঝরণা, চট্টগ্রাম)। চালের ব্যবসার জন্য ২০০০্ দু হাজার টাকা ধার দিয়াছিলাম। বস্তুতঃ তারই ছদ্মবেশে আর একটি বিপ্লব কেন্দ্র পরিচালিত হইত। এই সূত্রে আমি চট্টগ্রাম, সীতাকুণ্ডপাহাড়, কক্সবাজার ও পূর্ববঙ্গের অন্যান্য স্থান বেড়াইতে গিয়াছিলাম।

(৪) ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রের অন্যতম অধিনায়ক শ্রীরামপুরের জিতেন লাহিড়ী, কলিকাতায় হরিকুমার চক্রবর্তী, যতীন্দ্রলোচন মিত্রদের সহিত ঘনিষ্ঠতা ছিল। ১৯১৪-১৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এস-সি. পড়বার সময় পাঠ্য-পুস্তকের সহিত বিলাত হইতে ৮।১০ খানি যুদ্ধবিদ্যা সম্বন্ধে বই আমদানি করেছিলাম।

(৫) উত্তর ভারতে কাশীতে বন্ধু নেপাল ব্রহ্মচারী একটি স্কুলের আড়ালে গুপ্তসমিতি পরিচালনা করিত।

(৬) পরিশেষে পুলিশের মন্তব্য—আমি বিপজ্জনক লোক—ইহা কতদূর সত্য তাহা পাঠকবৃন্দই বিচার করিবেন।

"অনুশীলন সমিতির ইতিহাস" পুস্তকে রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখিত ভূমিকা—

ভারতের মুক্তিসংগ্রামে অনুশীলন সমিতির অবদান

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সহিংস ও সশস্ত্র বিপ্লববাদ যে একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল তাহা এখন প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। অহিংসা-বাদী মহাত্মা গান্ধীর শিষ্যগণও যে এখন তাহা মানিয়া লইয়াছেন তাহার প্রমাণ স্বরূপ বলা যায় যে কংগ্রেস সরকার ও কংগ্রেসের নিষ্ঠাবান অনুগামীরাও এখন বিপ্লবীদের স্মৃতিরক্ষার্থ বিপ্লবী নেতাদের মূর্তি প্রতিষ্ঠা ও চিত্র-প্রদর্শনীর প্রতি আগ্রহশীল। ভারতের বিপ্লববাদ উনিশ শতকে মহারাষ্ট্রে আরম্ভ হইলেও এই প্রদেশের বাহিরে বেশী প্রচার হয় নাই। বিংশ শতকের প্রথমে বঙ্গ বিভাগের প্রতিবাদে বঙ্গদেশে যে বিপ্লববাদের সূত্রপাত হয় তাহাই ক্রমে ক্রমে সমগ্র ভারতে বিস্তৃত হইয়া মুক্তি সংগ্রামের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। বঙ্গদেশের বিপ্লববাদের প্রথম ও প্রধান প্রতিষ্ঠান ছিল 'অনুশীলন সমিতি'। সুতরাং ভারতের মুক্তি সংগ্রামের সফলতায় অনুশীলন সমিতির অবদান খুবই মূল্যবান। অথচ এই সমিতির কোন ধারাবাহিক ইতিহাস এখনও পর্যন্ত লিখিত হয় নাই। "অনুশীলন সমিতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকায় শ্রীজীবনতারা হালদার অনুশীলন সমিতির যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা এই অভাব কিছুটা পূরণ করিবে। বিশেষতঃ বিপ্লবাত্মক কার্য ছাড়াও এই সমিতির সদস্যদের চরিত্র গঠনের—অর্থাৎ শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের যে আদর্শ ও তদনুযায়ী ব্যবস্থা ছিল তাহা আজকাল অনেকেরই জানা নাই। ভারতীয় বিপ্লববাদ যে কেবল হিংসাত্মক রাজনীতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, বিপ্লবাদীরা যে বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল এবং বঙ্কিমচন্দ্র যে ব্যাপক অর্থে 'অনুশীলন' শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, বাংলার অনুশীলন সমিতি যে সেদিক দিয়া সার্থক-নামা হইবার প্রয়াস করিয়াছিল এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতীয় বিপ্লববাদের ভিত্তি ও স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়া গ্রন্থকার বাঙ্গালী পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। গ্রন্থকার নিজে বহুদিন অনুশীলন সমিতির বিশিষ্ট সদস্যরূপে ইহার উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। সুতরাং এই গ্রন্থখানির ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য।

১।৬।৭৬ — শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্বন্ধে পুস্তকের তালিকা

1. Roll of Honour—Kali Charan Ghosh.
2. History of the Freedom Movement in India —R. C. Mazumdar
3. The Underground Revolutionary Movement in Bengal (Doctorate Thesis)—Dr. Amiya Kumar Roy.
4. Indian Revolutionaries Abroad (Doctorate Thesis) —A. C. Bose.
5. Sedition Committee Report—Mr. Justice S. A. T. Rowlatt.
6. In Search of Freedom—Jogesh Chandra Chatterjee.
7. Two Great Revolutionaries—Uma Mukherjee & Haridas Mukherjee.
8. Rashbehari Basu : his struggle for India's Independence —Radhanath Rath and Sabitri Prasanna Chatterjee.
9. The Spark of Revolution—Arun Chandra Guha.
10. Indian Freedom Movement—Kalyan Kumar Banerjee.
11. Indian Struggle—Subhas Ch Bose.
12. Awakening in Bengal—Gautam Chattopadhyaya.
13. The Voyage of Komagata Maru—Gurdit Singh.
14. Indian Bastille (Andamans)—Bejoy Kumar Singh.
15. Penal Settlement in Andamans—Dr. R. C. Mazumdar.

১। জাগরণ ও বিস্ফোরণ ১ম ও ২য় খণ্ড—কালীচরণ ঘোষ
২। বাংলার ইতিহাস—৪র্থ খণ্ড স্বাধীনতা সংগ্রাম—রমেশচন্দ্র মজুমদার
৩। অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস—ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত
৪। বাংলায় বিপ্লববাদ—নলিনীকিশোর গুহ
৫। বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি—ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়
৬। জেলে ত্রিশ বছর—ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী
৭। নির্বাসিতের আত্মকথা—উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী

৮। বহির্ভারতে ভারতের মুক্তি প্রয়াস—অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য
৯। বিপ্লবের পদচিহ্ন—ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত
১০। আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী—মতিলাল রায়
১১। অগ্নিদিনের কথা—সতীশ পাকড়াশী
১২। বিপ্লবীযুগের কথা—প্রভাতচন্দ্র গাঙ্গুলী
১৩। মুক্তির সন্ধানে ভারত—যোগেশচন্দ্র বাগল
১৪। বহির্ভারতে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—ক্ষীরোদকুমার দত্ত
১৫। পি. মিত্র—ক্ষীরোদকুমার দত্ত
১৬। বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা—হেমচন্দ্র কানুনগো
১৭। বন্দীজীবন—শচীন্দ্রনাথ সান্যাল
১৮। অবিস্মরণীয়—গঙ্গানারায়ণ চন্দ্র
১৯। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন—চারুবিকাশ দত্ত
২০। বিপ্লবী বাংলা—তারিণীশঙ্কর চক্রবর্তী
২১। আত্মকাহিনী—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ
২২। ভারতের বিপ্লবকাহিনী—হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত
২৩। বিপ্লবের তপস্যা—জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী
২৪। সবার অলক্ষ্যে—ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায়
২৫। বিপ্লবীর স্মৃতি-চারণ—অখিলচন্দ্র নন্দী
২৬। বিপ্লব কাহিনী—প্রভাস লাহিড়ী
২৭। শ্রীঅরবিন্দ ও স্বদেশী যুগ—গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী
২৮। নমামি—জিতেশ লাহিড়ী
২৯। রুশ বিপ্লব ও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী—চিন্মোহন সেহানবীশ
৩০। আত্মজীবনী—পুলিন বিহারী দাশ

———